প্রথম অধ্যায়

বিনয় মজুমদার : যুগ ও জীবন

যুগের এজলাশে জীবন, জীবনের ইতিহাসে স্রষ্টা ও সৃষ্টি যেন ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ! অগ্নিতে পুড়ে যেতে-যেতে কিংবা পাখা ছিঁড়ে পড়ে যেতে-যেতে, মনের, তবু বারবার করে জীবনকেই জড়িয়ে-জাপটে ধরা। জীবনের সঙ্গে সমন্বয় এবং জীবনের সঙ্গে সংঘাত— এই উভয় নিরিখেই মনের তলহীন প্রকোষ্ঠে শিল্পের জন্ম হয়। রং বা রেখা, শিল্পের যে ধারাই তা হোক, সকল শিল্পীরই জীবন ও সমকাল তাঁদের শিল্পবোধ ও তাঁর-তাঁর সৃজিত শিল্পক্ষেত্রের সন্ধান, অনুসন্ধান ও আলোকপ্রাপ্তির মাস্টার-কি। শিল্পিমানস ও শিল্পমানসিকতার গড়নে সময়ের প্রক্ষেপ নেহাত সাময়িক নয়। কেননা, যুদ্ধস্নাত সিরিয়ার যে ছোট মেয়েটি ফোটোগ্রাফারের লম্বিত লেন্সকে বন্দুক ভেবে আজ 'হ্যান্ড্স আপ' হচ্ছে, সে কোনওদিনই বড় হয়ে টফি আর গোলাপের গল্প বলবে না, বলতে পারে না, সেটাই স্বাভাবিক। বিশ শতকের অন্তত প্রথম অর্ধের অধিকাংশ শিল্পকার ও শিল্পই আদতে উত্তর-সামরিকী যেমন।... বিনয় মজুমদারের সাহিত্য আলোচনায় তাঁর বিচিত্র জীবনপথটির কথা তাই সঙ্গত কারণেই আসবে। উল্লেখ করবার মতো জীবনপর্বগুলি তিনি বর্মা (মায়ানমার), ফরিদপুর (এখন বাংলাদেশ), কোলকাতা ও শিমুলপুর (ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা)-এ কাটিয়েছিলেন।

বর্মা-জীবন :

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (৩১শে ভাদ্র, ১৩৪১ সন), রাত ১২ টা ২০ মিনিটে এক বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে তৎকালীন বর্মা (অধুনা মায়ানমার)-র মিকটিলা জেলার তেডো নামক শহরে বর্ণগতভাবে এক নমঃশূদ্র পরিবারে বিনয়ের জন্ম। বাবা বিপিনবিহারী মজুমদার ও মা বিনোদিনী দেবী। ঠাকুরদা নিমচাঁদ মৃধা। ছয় ভাইবোনের মধ্যে বিনয় কনিষ্ঠ। শ্রীযুক্ত তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বিনয় স্বয়ং তাঁর পরিবারপ্রশাখা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। "...আমরা ছয় ভাইবোন। সবাই বুড়ো বুড়ী হয়ে গেছি। সবাই চাকরী থেকে অবসর নিয়েছি। আমার বড়দাদার ঠিকানা অনিল বরণ মজুমদার; ৩, কমল পার্ক; কলিকাতা ৫১। আর কোনো ভাইবোনের ঠিকানা আমি জানি না। অন্য ভাই বোনের নাম শুধু জানাতে পারি— মেজদাদা সুনীলকুমার মজুমদার। বড় বোন রেণুবালা বিশ্বাস। মেজ বোন শৈলবালা মণ্ডল। ছোট বোন চারুবালা মজুমদার।..."[১] একাকিত্বের যে অন্ধ সরোবর বিনয় জীবনভর সাঁতরালেন (নাকি হাতড়ালেন!), উদ্ধৃত পত্রাংশটি তার দলিলও বটে। তাঁদের আদত পদবী মৃধা। পদবী পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিনয়-গবেষক শ্রী অমলকুমার মণ্ডল জানাচ্ছেন—

"...চাকরিজীবনের রেকর্ডে তাঁর বাবা বিপিনবিহারী মৃধা নামেই লিপিবদ্ধ হয়েছেন। এক বিশেষ মুহূর্তে অনিলবরণ জানিয়েছিলেন, তাঁরা বোঝার আগেই বাবা অ্যাফিডেইভিট করে তাঁর পদবি পালটিয়েছিলেন। তিনি এবং মেজভাই যখন ওড়াকান্দি স্কুলে যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন, তখন মজুমদার পদবি নিয়ে তাঁরা ভর্তি হয়েছিলেন।"[২] এমনকী 'দহন প্রক্রিয়ার পত্ররূপ দাহপত্র'–এর জুন ও ডিসেম্বর, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতার শেষে বিনয়ের 'বিনয় মেদ্দা-মৃধা-মজুমদার' সূচক মজাদার একটি স্বাক্ষর উদ্ধার করা গেছে। বিনয়ের বড়দা অনিলবরণ কোলকাতার আয়কর ভবনে চাকুরিরত ছিলেন। আর মেজদা সুনীলকুমার ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট। বিনয়ের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়— তাঁর বাবা বিপিনবিহারী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা পাশ করেছিলেন ১৯২০ সাল নাগাদ এবং তিনি কর্মজীবনে পি.ডব্লুও.ডি.-র ওভারসিয়ার ছিলেন।[৩] ব্রহ্মদেশীয় জঙ্গলমহলে তাঁর ডিউটি পড়ত। অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদাধিকারী। বিনয়ের প্রথাগত শিক্ষাজীবন ও কবিতাজীবন প্রসঙ্গে আমরা ইতিমধ্যেই যতটুকু ওয়াকিবহাল, তাতে করে এই কথা নিশ্চিত বলা যায় যে, জিনসূত্রেই বিনয়রা তাঁদের ঈর্ষনীয় মেধা ও ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বিনয়ের পিতৃদেব বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ইংরেজি ও বর্মাভাষা জানতেন। (সূত্র : বিনয় মজুমদার, 'আমি রামায়ণ পড়িনি', (কা.গ্র. 'আমিই গণিতের শূন্য'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ : ১৭১) কলেজজীবনে বিনয় যে বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি রুশ ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে বিনয়ের পিতার ভাষাজ্ঞান স্মর্তব্য।

বিপিনবিহারী প্রাক্-যৌবনেই চাকুরিরত ও বিদেশগামী হয়েছিলেন। মাঝে একবার খালি ফরিদপুরে ফেরা ও বিবাহ; বছর চোদ্দ-র বিনোদিনীকে অতঃপর একা করে একা বর্মা ফিরে যাওয়া। এর দু'বছর পর তাঁকে স্বামিসংসারের অংশ হবার জন্য বর্মামুলুকের জাহাজে উঠিয়ে দেওয়া হয়, জাহাজযাত্রার সঙ্গী বলতে শুধু এক জ্ঞাতি ভাই। বর্মার প্রচলিত ভাষা বিনোদিনীর বোধের বাইরে, কর্মব্যস্ত স্বামীর সাহচর্যও তিনি খুব একটা পান না। আবার প্রবাসকালে তাঁর একমাত্র বন্ধুস্থানীয় ভাইটিরও ছ'মাসের ভিতরে বসন্তরোগে মৃত্যু হলে ষোড়শী বিনোদিনী মরমে মরেন। এ সমস্ত তথ্যই বিনয়ের কোলকাতাজীবন ও মাঝযৌবনের হিতৈষী বন্ধু জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা থেকে জানা যাচ্ছে।[৪] তাঁর শোনা, দেখা ও লেখায় পাচ্ছি বিনয় সংক্রান্ত আরও স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন— "যে পারক্যবোধে বিনয় ডুবে আছেন তা কিঞ্চিৎ পারিবারিক। বিনয়ের স্মৃতিতে নিজের বাবার সঙ্গে সবচেয়ে কাছাকাছি হওয়ার যে ছবিটি আছে তা একাধারে অনিরাপত্তার ও ঘনিষ্ঠতার। জাপানিরা বর্মায় পৌঁছলে মজুমদার পরিবার হাঁটাপথে দেশে

ফিরছিলেন : বিনয়ের মনে আছে এক পাহাড়ী ঝরণায় তাঁর বাবা তাঁকে স্নান করাচ্ছেন। কিন্তু এতটা ঘনিষ্ঠতা বিরল। এরপর থেকে বিনয়ের জীবন হস্টেলে কেটেছে। নিঃসম্বল অবস্থা থেকে একা-একা যুদ্ধ ক'রে আর্থিক নিরাপত্তার বয়া অবশেষে পেয়েছিলেন বিনোদবিহারী [বিপিনবিহারী?]। সহজ আবেগকে সন্দেহ এবং নিরপেক্ষ টাকার [থাকার?] নিরুত্তাপ ক্ষমতাকে সম্মান— এই দুই চালিত করেছে কবির পরিবার।"[৫]

বার্মিজ সংস্কৃতিতে প্রবাসী বিপিনিবিহারী হয়তো বা কিছুটা জড়িত বা তাড়িত ছিলেন সে'সময়। সেই রীতিপ্রথা মেনে বিনয়ের ডাকনাম রাখা হয়েছিলো মংটু। তৎরাষ্ট্রিক বিশিষ্টতানুসারে নারীনামের শুরুতে 'মা' (উদা. মাফু, মাতিন, মারি ইত্যাদি) (সূত্র : বিনয় মজুমদার; 'আমি তো জন্মেছিলাম'; পৃথিবীর মানচিত্র; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২; কলকাতা-২৩; পৃ : ৫৪) এবং পুরুষনামের শুরুতে শৈশব-কৈশোরে 'মং', যৌবনে 'কো' ও বার্ধক্যে 'ড' ব্যবহৃত হয়। অতএব বিনয়ের বাল্যকালের আসল নাম 'টু'। বড়দা অনিলবরণ আজীবন 'টু' নামে ডেকেছেন কবিকে, আর বাবা-মা'র কাছে তিনি তো বয়েসেও ছোট্টটি, 'মংটু' নামে পেয়েছেন অযুত আদর।

বিনয়ের বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময় বর্মায় কাটে, ফরিদপুরে কিছুদিন। বর্মার তেডোর রুক্ষ বালুকাবিস্তীর্ণ পরিবেশে মা'র সাহচর্যে বাংলার 'দুঃখিনী বর্ণমালা' বিনয়ের হৃদয়ের আঙিনায় আসন পাতে। সঙ্গে খানিক নামতা পাঠও হয় শুরু। বাল্যভূম তেডো সম্পর্কে কবি জানাচ্ছেন— শুকনো দেশ। আমি যেখানে থাকতাম— মাইলের পর মাইল বালি, মাটি বলে কিছু নেই। মাঝে মাঝে একটা করে নিমগাছ আর নানা ধরনের ঝোপ— মরুভূমির পাতামোটা যেসব গাছ আছে না— সেইগুলো ওখানে।[৬] জ্যোতির্ময় দত্ত বিনয়ের জন্মসাল ১৯৩৫ খ্রিঃ বলে তাঁর বিনয় সংক্রান্ত একটি গদ্যে[৭] উল্লেখ করলেও তা যথার্থ নয়। কবির সর্বজ্যেষ্ঠ দাদা অনিলবরণ একটি লেখায়[৮] বিনয়ের জন্মবৎসর ১৯৩৪ খ্রিঃ বলেই আমাদের জানিয়েছেন। বিনয় স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়েছেন— "বার্মায় তেডো শহরে আমি জন্মেছি, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর।"[৯] এর পরপরই বাবা-মা'র কোলে চড়ে বিনয়ের একবার পিতৃভিটে ফরিদপুরে আসা। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার তারাইল গ্রাম। অমলকুমার মণ্ডল মুকসুদপুর; অন্যনামে ট্যাংরাখোলা থানার কথা উল্লেখ করলেও[১০] একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় নিজে জানিয়েছেন, "তাড়াইল [তারাইল?] গ্রাম, থানার নাম ট্যাংরাখোলা।"[১১] তার পরের কিছু গল্প বিনয়ের জবানে শোনা যাক : "আমাকে নিয়ে বাবা মা ফের জাহাজে করে কলকাতা থেকে রেঙ্গুনে যায়, এই জাহাজে থাকা কালে আমি উড়ন্ত মাছ দেখেছিলাম। মাছ দেখার দৃশ্যটি এখনো আমার মনে আছে। এর আগেকার ঘটনাবলীর কথা আমার বিশেষ মনে নেই। তারপর বার্মা গিয়ে বাবা এলাতে বাবার নতুন কর্মস্থলে যায়। এইখানে বার্মার সব বাড়ির মত কাঠের

তৈরী একটি দোতালা বাড়িতে আমরা থাকতাম। দোতালার বারান্দায় বসে আমি ক, খ, গ শিখতাম মায়ের কাছ থেকে। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে একখানা জলচৌকির উপর বসে লেখাপড়া করতাম। আমাদের বাড়ির পিছনে একটি বিরাট গাছ ছিল, সেই গাছে অনেকগুলি বকের বাচ্চা বসে থাকতো, তখন ও তারা উড়তে শেখেনি প্রত্যেকদিন সন্ধের একটু আগে একটি বক মুখে করে মাছ নিয়ে এসে ঐ বকের বাচ্চাদের খাওয়াতো।"[১২] উদ্ধৃত অংশটি থেকে দুটো-একটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, ছোটতে উড়ন্ত মাছ দেখার স্মৃতিচিত্র পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত উজ্জ্বল মাছের উজ্জ্বল উদ্ধার (১ নং কবিতা, 'গায়ত্রীকে') হয়ে ফিরে এসেছে। আর দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বিপুল প্রেক্ষা ও তার চুলচেরা অনুষঙ্গের প্রতি অদম্য টান-ভালোবাসা, যা বিশেষত তাঁর অন্তিমপর্বের কবিতাগুলির প্রধানমূল, তা কবির আবাল্য। তাছাড়া নিরাসক্ত ভঙ্গিমা ও অনুপুঙ্খ বিবরণের চিত্রশালা তাঁর যে শেষ সময়ের কবিতাগুলি ও জীবনভর খাপছাড়াভাবে লিখিত গল্পগুলি, তার সূত্রবীজ আত্মপরিচয়ের ঢঙসম্বলিত বিবিধ লেখা বা আলাপচারগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। নির্বাচিত অংশ : "...ঐ শহরে অনেক বাঙালী পরিবার ছিল। একটা লোক ছিল গরু কাটবার কাজ করত সে, গরু কেটে কেটে মাংস বিক্রি করত। এই লোকটির যখন মরবার সময় উপস্থিত হলো তখন মরবার আগে গরুর মত হাম্বা হাম্বা করে ডাকছিল।

"আর এক বাঙালী পরিবারের কর্তা হাতুড়ে ডাক্তার ছিল। সে একটি গ্রামোফোন বাজাতো। একটি গান বাজাতো আমার এখনো এক লাইন মনে আছে— গানটি এরকম— "বার হ, বার হ রে হাপ লোকে তোরে দেখতে চায়...।"

"এই এলা থেকে বদলি হয়ে বাবা ফের তেডোতে চলে আসে। তেডো একটি ছোট রেলস্টেশন। রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে তাকালেই দেখা যেতো 'মানডেলে' স্টেশনটি, ছোটবেলায় চোখ এত ভালো থাকে মানুষের। রেল স্টেশনে সুন্দরম্ নামে এক হিন্দুস্থানী বিস্কুট, লজেন্স বিক্রি করতো। বিস্কুটগুলি হাতির মত, হাঁসের মত, মুরগীর মত ছিল। এই তেডো শহরটি বলতে গেলে মরুভূমির মত ছিল। পায়ের নিচে ঘাস ছিল না শুধু বালি। বালির ভিতরে দুটো নিমগাছের কথা এখনো মনে আছে। বুনো মুরগি উড়ে এই নিমগাছে এসে বসতো। এই বালি রোদ্দুরে গরম হয়ে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গায়ে এসে লাগতো এবং গা পুড়তে থাকতো। আমাদের বাড়িতে বা, কোন বাড়িতেই নলকূপ ছিল না ইঁদারা থেকে জল তোলা হতো। আমাদের বাড়িতে কাজ করতো রামস্বামী এবং তার বর্মা বউ মাফু। রামস্বামী বাঁকে করে জল নিয়ে আসত। এই মরুভূমি সুদৃশ্য তেডোতে ফনীমনসা গাছ ছিল প্রচুর। বাবার বাংলোর পাশেই ছিল বাবার অফিস। অফিসের দরজাতেই ছিল একটি বিরাট নিমগাছ।..."[১৩] বিনয়ের গল্পে ও শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে তথাকথিত যে সাধারণ মানবমিছিল ও মানবকরণের

সাধারণী চোখে পড়ে, তাঁর স্মরণের সরণিতে সে-জাতীয় ছবিগুলি বহু পূর্বেই কোনও না কোনও ভাবে রুয়ে গিয়েছিলো, বোঝা যায়। জীবনের উপান্তে চৌষট্টি বছর বয়েসে দাঁড়িয়ে দেওয়া কবির বিদিত প্রবাদতুল্য স্মৃতিশক্তির সাক্ষ্যও এটি। "মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং।/ হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।।"— শঙ্করাচার্যের প্রবাদতুল্য পদটির যে মর্মার্থ শিশুবিনয় বর্মানিবাসী বাঙালি কসাই মানুষটির জীবন ও জীবনীর ভিতর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই মূল থিম (theme) করে তাঁর 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের 'মায়ের' শীর্ষক কবিতাটি আকার পেয়েছে বলে মনে করা চলে। এরপর বিশ শতকের চল্লিশের দশকের উত্তাল দিনগুলির সূচনা হতেই বিনয়ের জীবনের শৈশবপর্বে আকস্মিক বাঁকবদল আসে। সজল করুণ সমরসত্য তাঁর মনপলিতে কবিতার সমস্ত স্নিগ্ধতার বদলে হিংসার মনোপলি উদ্‌গার করে। এমনিতেই উনিশ শতক ও বিশ শতকের মধ্যকার ফারাক উনিশ-বিশ নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক ধরনের অস্বাচ্ছন্দ্য, শিকড়ঝাঁকি ক্রমায়ত বিস্তৃতি নিতে থাকে। নব্য, নব্যতর উদ্বাস্তুকরণের চতুর প্রবণতা তখন আবিশ্ব ছেয়েছে। আবার এরই প্রতিপক্ষে বিবাদীর ভুমিকায় লগ্ন হয় বিবিধ মুক্তিসংগ্রামগুলি। ফলত রক্তাক্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। এ শতক তাই আবহমান পার্থিব নদীগুলিকে রক্তস্রোতে উদ্বেল হয়ে যেতে দেখেছে, দেখেছে স্বার্থবদ্ধ সুতোগুলো ছিঁড়েকুটে গেলে মানবকল্প মানবত্ব হুমড়ি খেয়ে এদিক-ওদিক পড়ে থাকে, দেখেছে হৃদয়ে অবমাননার পাহাড় কীভাবে সূর্যতোরণ অবধি ঢেকে দিতে পারে। আর ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশগুলি তো অন্যের আনন্দেই দেখে দেখে গেছে বিচিত্রিত ক্যালাইডোস্কোপ। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবনা, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯০৫ খ্রিঃ-১৯১১ খ্রিঃ), মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা (১৯০৬ খ্রিঃ), কোলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর (১৯১১ খ্রিঃ), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ খ্রিঃ-১৯১৮ খ্রিঃ), রাওলাট আইন পাশ (১৯১৯ খ্রিঃ-র ফেব্রুয়ারি), জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা (১৯১৯ খ্রিঃ-র ১৩ এপ্রিল), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ খ্রিঃ-র সেপ্টেম্বর-১৯২২ খ্রিঃ-র ফেব্রুয়ারি), ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (২৬ ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রিঃ), কোলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯২৬ খ্রিঃ), আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন (১৯৩০ খ্রিঃ), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২ খ্রিঃ), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ খ্রিঃ-১৯৪২ খ্রিঃ), বাংলা পঞ্চাশে বাংলাব্যাপী ভয়াল মন্বন্তর (১৯৪৩ খ্রিঃ) নেতাজির অন্তর্ধান (১৯৪৫ খ্রিঃ), নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬ খ্রিঃ), তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন (১৯৪৬ খ্রিঃ) নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৬ খ্রিঃ) প্রভৃতি সাঁতরে শেষমেশ বিখণ্ড স্বাধীনতা (১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিঃ)।[১৪]

এখানে একটা কথা বলবার যে, ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অবস্থান শাসক ব্রিটেনের

রসদশালারূপে এবং নেপথ্যের কারণ সর্বতোভাবেই উপনিবেশিক বাধ্যতা, অন্যগুলি তার নিজস্ব শিকলছেঁড়ার গান। এর পাশাপাশি বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বৈশ্বিক রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্পসাহিত্যিক পরিবর্তনগুলি (বৈজ্ঞানিক ও চলচ্চিত্রীয় প্রসঙ্গ আমাদের আলোচ্য নয়) সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আগ্রাসন ও রুশ-জাপান দ্বৈরথ (১৯০৪ খ্রিঃ), রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ধর্মঘটী-গণহত্যা (১৯০৫ খ্রিঃ), ফ্রান্সের প্যারিসে ফভিস্টিক শিল্পীদের প্রথম প্রদর্শনী (১৯০৫ খ্রিঃ), সুইডিশ ইউনিয়নের কবল থেকে নরওয়ের মুক্তিপ্রাপ্তি (১৯০৫ খ্রিঃ), পাবলো পিকাসোর বহুখ্যাত কিউবিজ্‌মের উদ্ভব (১৯০৭ খ্রিঃ) , জাপান কর্তৃক কোরিয়া অধিগ্রহণ (১৯১০ খ্রিঃ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জ্যাজ সঙ্গীতের জন্ম (১৯১০ খ্রিঃ), রাশিয়ায় শিল্পে অ্যাবসার্ডিটির উন্মেষ (১৯১০ খ্রিঃ), মেক্সিকো বিপ্লব (১৯১০ খ্রিঃ), জার্মানির বেলজিয়াম অভিযান, জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেনের যুদ্ধঘোষণা ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু (৪ আগস্ট, ১৯১৪ খ্রিঃ), বেলজিয়ামের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ফ্রান্সে ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা ও জার্মানির অসাফল্য (১৯১৪ খ্রিঃ), রাশিয়ার হাঙ্গেরি আক্রমণ (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খ্রিঃ), অস্ট্রিয়ার প্রতিপক্ষে ইতালির যুদ্ধে যোগদান (১৯১৫ খ্রিঃ), তুর্কি শাসন থেকে আরব ও জর্ডনের মুক্তিপ্রয়াস (১৯১৬ খ্রিঃ), প্রিন্স ফেলিক্স য়্যুসুপভ কর্তৃক রুশ সন্ত গ্রেগরি রাসপুটিনকে হত্যা (১৯১৬ খ্রিঃ), ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির দাবি তুলে আইরিশ কবি পাদ্রেইক পিয়ার্স গ্রেফতার (১৯১৬ খ্রিঃ), গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনে জার্মান বোমারু হানা এবং ইতালিতে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির যৌথবাহিনীর হানাদারি (১৯১৭ খ্রিঃ), রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব (২৫ অক্টোবর, ১৯১৭ খ্রিঃ), রাশিয়ায় জারবংশ ধ্বংস (১৯১৮ খ্রিঃ), রাশিয়ার রণাঙ্গন ত্যাগ (১৯১৮ খ্রিঃ), চিনের দখলদারি থেকে মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতালাভ (১৯২১ খ্রিঃ), নেপল্‌স থেকে রোম পর্যন্ত ফ্যাসিনায়ক মুসোলিনির স্পর্ধিত কুচকাওয়াজ (১৯২২ খ্রিঃ), সুর-রিয়ালিস্ট ম্যানিফোস্টোর প্রকাশ (১৯২৪ খ্রিঃ), রুশ নেতা ভ্লাদিমির লেনিনের প্রয়াণ (১৯২৪ খ্রিঃ), নাৎসি নেতা অ্যাডল্‌ফ হিটলারের আত্মজীবনী ‘Mein Kamph’ প্রকাশ (১৯২৫ খ্রিঃ), সুর-রিয়ালিস্ট শিল্পীদের প্রথম প্রদর্শনী (১৯২৫ খ্রিঃ), জোসেফ স্ট্যালিন কর্তৃক বলশেভিক বিপ্লবে লেনিনের সর্বময় সহযোগী লিও ট্রটস্কিকে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার (১৯২৭ খ্রিঃ), জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার (১৯৩১ খ্রিঃ), স্পেনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯৩১ খ্রিঃ), জার্মান চ্যান্সেলরের পদে অ্যাডল্‌ফ হিটলারের অভিষেক ও এক্সপ্রেশনিস্ট, সুর-রিয়ালিস্ট শিল্পীদের জার্মানি ত্যাগ (১৯৩৩ খ্রিঃ), মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে চিনে কমিউনিস্টদের লং মার্চ ও অগণন কমিউনিস্ট-নিধন (১৯৩৪ খ্রিঃ), মুসোলিনির নেতৃত্বে ইতালির আবিসিনিয়া আগ্রাসন (১৯৩৫ খ্রিঃ), হিটলার-শাসিত জার্মানিতে ইহুদি-নিগ্রহের সূচনা (১৯৩৫ খ্রিঃ), জার্মানির বার্লিনে ফ্যাসি নেতা বেনিতো মুসোলিনি এবং নাৎসি নেতা অ্যাডল্‌ফ হিটলারের সাক্ষাৎ ও রোম-বার্লিন অক্ষশক্তির বৈঠক (১৯৩৬ খ্রিঃ),

বামপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে একনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কো সমর্থিত ন্যাশানালিস্ট পার্টির অভ্যুত্থান, স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত, কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা-কে গুলি করে নৃশংস হত্যা (১৯৩৬ খ্রিঃ), চিনের সাংহাইতে জাপানের বোমাবর্ষণ (১৯৩৭ খ্রিঃ), রাশিয়ায় স্ট্যালিনের স্বেচ্ছাচারীরাজ ও পছন্দমাফিক নির্বিচার হত্যালীলা (১৯৩৭ খ্রিঃ), জার্মানির চেকস্লাভাকিয়ার কিয়দংশ ও অস্ট্রিয়া অধিকার (১৯৩৮ খ্রিঃ), জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা (১৯৩৯ খ্রিঃ), ইতালি ও জার্মানির মধ্যে 'প্যাক্ট অব স্টিল' স্বাক্ষর (১৯৩৯ খ্রিঃ), হিটলার ও স্ট্যালিন-এর মধ্যে পারস্পরিক 'নন-অ্যাগ্রেসন প্যাক্ট' সাবুদ-সমঝোতা (১৯৩৯ খ্রিঃ), তিব্বতে পঞ্চমবর্ষীয় বালকের চতুর্দশ দলাই লামার পদাধিকার ও ব্রিটেনে উইন্সটন চার্চিলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ (১৯৪০ খ্রিঃ), হিটলারের জার্মানির বিপক্ষে ব্রিটেন যুদ্ধের অবতারণা (১৯৪০ খ্রিঃ), হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারে জাপানের চকিত হানা, সংখ্যাতীত প্রাণমূল্যের ক্ষতি ও বিশ্বযুদ্ধে সেই প্রথম সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণ (১৯৪১ খ্রিঃ) , নাৎসি জার্মানি কর্তৃক গ্রিস ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ অধিকার এবং ইউক্রেন আক্রমণ (১৯৪১ খ্রিঃ), ব্রিটেনকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুশভেল্টের লিখিত সম্মতিপ্রদান (১১ মার্চ, ১৯৪১ খ্রিঃ), জার্মান বোমায় ব্রিটেনের হাউস অব কমন্স ধ্বংস (১০ মে, ১৯৪১ খ্রিঃ), জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ (১৯৪১ খ্রিঃ), জার্মানির বৃহত্তম রণতরী 'বিসমার্ক' কর্তৃক রয়্যাল নেভির সর্ববৃহৎ সমরযান 'এইচএমএস হুড'-এ তাণ্ডবলীলা ও প্রভূত লোকক্ষয় (১৯৪১ খ্রিঃ), জাপানের সিঙ্গাপুর আক্রমণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাপান আক্রমণ (১৯৪২ খ্রিঃ), পূর্ব ইউরোপে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নির্মাণ ও নাৎসি অধিনায়ক অ্যাডল্ফ হিটলারের শীতল মস্তিষ্কের পরিচালনায় ইহুদি হত্যালীলা (১৯৪২ খ্রিঃ), স্টালিনগ্রাডে রাশিয়ার কুশলী রেড আর্মির সম্মুখে জার্মান সেনার ভরাডুবি (৩১ জানুয়ারি, ১৯৪৩ খ্রিঃ), নাৎসি-ফ্যাসি জোটে চিড়, ইতালির অক্ষ-ত্যাগ (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ খ্রিঃ), অস্ট্রেলিয় নৌসেবাযানে জাপানি সাবমেরিন হামলা (১৪ মে, ১৯৪৩ খ্রিঃ), লন্ডন শহরে জার্মান ভি২ মিসাইল হানা (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ খ্রিঃ), নাশকতার হাত থেকে হিটলারের রক্ষা (২০ জুলাই, ১৯৪৪ খ্রিঃ), পোল্যান্ডের ওয়ারশ-তে গণবিপ্লব (৮ আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রিঃ) চার বছরের তিক্ত জার্মান জমানা থেকে প্যারিসের মুক্তি (২৫ আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রিঃ), মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুশভেল্টের প্ররোচনা ও নির্দেশনায় কুখ্যাত ম্যানহাটন প্রোজেক্ট গঠন (১৯৪৪ খ্রিঃ), জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আমেরিকার পরমাণু পরীক্ষা ও ধ্বংসতাণ্ডব (৬ ও ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রিঃ), মহাসমরে জার্মানির শোচনীয় পরাজয় (১৯৪৫ খ্রিঃ)[১৫] – সংক্ষিপ্ত চিত্র এই।

এত তথ্য ও অভ্যন্তরীণ কথা এ-জন্যই উশ্‌কে দেওয়া গেলো, কেননা অন্যান্য বিশ শতকের

জাতকের মতোই বিনয়ের সম্যক মনোগঠনও সংশ্লিষ্ট সময়কার মনুষ্যনির্মিত আবহাওয়ার ক্রীড়নকপ্রতিম। এই শতক জানে বাজার, বস্তি, দালাল ও বেশ্যার শহরের লাল-নীল মানচিত্র, সংস্কৃত ধনিকশ্রেণির হাত থেকে অসংস্কৃত বণিকশ্রেণির হাতে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর, ব্যবসায়িক যুদ্ধ ও যুদ্ধের রাজনীতি। এই শতাব্দীর সন্তানদের তাই অতি সঙ্গত কারণেই 'যুদ্ধশিশু' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝলগ্নে উন্মাদের উল্লাসের রূঢ়তা বিনয়ের আশরীরমন প্রোথিত হলো— "...বাবার অফিসের সামনে নিমগাছটির ছায়াতে বিরাট একটি গর্ত খুঁড়ল গভর্নমেন্ট। গভীর গর্তের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাত তুললে সে হাত দূরের লোকেরা দেখতে পেতনা। এই গর্তের মধ্যে দু-খানা খাটিয়া পেতে দিল। গর্তে নেমে খাটিয়ায় বসার জন্য মাটি কেটে সিঁড়ি তৈরী করে দিল। এবং বড় বড় গাছ কেটে সেই গুলি গর্তের উপর রেখে গর্তের একটি ছাদ করে দিল। এই ছাদের উপরে বালির বস্তা রেখেছিল বহু যাতে বোম পড়লে আগুন না লাগে। যেই জাপানী উড়োজাহাজ আসত তখনই সরকার জোরে সাইরেন বাজিয়ে দিত এবং আমরা সবাই ছুটে গিয়ে সেই গর্তের ভিতর নেমে খাটিয়ার উপর বসে থাকতাম। সমস্ত কর্মচারীর বাড়িতেই এই রূপ ভূ-নিম্নস্থ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল বৃটিশ সরকার।..."[১৬]

কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটিশরা উত্তরোত্তর পশ্চাদসরণ করলে বর্মাবাসী ভারতীয়রা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকেই শ্রেয় বলে মনে করলেন। রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার অভাবহেতু কুঁকড়ে যাওয়া মজুমদার পরিবারও বর্মা ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করেনি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো অন্যত্র। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় সমস্ত যাত্রীবাহী জাহাজগুলিই ততদিনে সৈন্যবাহী জাহাজে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায়, ব্রিটিশ সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের পায়ে হেঁটে ভারতে ফেরার অনুমতি দেয়। প্রথমে 'তেডো'-র কাছেই 'তাজি' নামের একটি শহরে এসে বিনয়রা সপরিবারে একটি বাঙালি বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। বিনয় জানাচ্ছেন— "এই বাঙালীর বাড়িটি তিনতলা ইঁটের দালান, কাঠের নয়। সেখানে আরও বহু ভারতীয় এসে উপস্থিত হলো।"[১৭] অতঃপর, তাজি থেকে ট্রেন, গোরুর গাড়ি ও নৌকো— এই ত্রিবিধ মাধ্যমে ও সব শেষে হাঁটাপথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একযোগে দেশের উদ্দেশে রওনা হলেন তাঁরা। বর্মার টাঙ্গু শহর থেকে তাঁদের হাঁটা শুরু হয়। সেখান থেকে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল আসতে সুদীর্ঘ এক মাসের ধাক্কা। নাগা, খাসিয়া প্রভৃতি পাহাড় আর ঘন অরণ্যপথের বিপদসঙ্কুলতা অতিক্রান্ত দিনেরাতে সেদিনকার বাস্তব নাবাল বিনয়ের না-লেখা মনপটে লালিত মায়ামুকুর এক লহমায় নস্যাৎ করেছিলো। আর রুক্ষশুষ্কতা ও বিপন্নতার সেই ছাঁচে বিনয় তো আমৃত্যু বাঁধা। অনেক পরের একটি স্মৃতিকথায় বিনয়ের খেদোক্তি ছিলো এরকম— "এই গদ্য ঘেঁষা পৃথিবীতে গদ্যময় জীবনযাপন করতে করতে কবিতাও আমার গদ্য ঘেঁষা হয়ে গেছে।"[১৮] প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ মাইল করে

হাঁটতে হতো তাঁদেরকে। ইম্ফল থেকে তৎকালীন পূর্ব ভারতের ফরিদপুর অবধি পৌঁছতে আরও দেড় মাস। এই নিরন্তর পথ চলার যে আনন্দ, তা একমাত্র বোধ হয় ঘরে ফেরবার বাসনাসম্ভূত। নচেৎ, তা খুব সুখের ছিলো না। রাত্রে কখনও কখনও বাসস্থান মিলত, কখনও অপার গাছতলাকেই বাসা বানিয়ে নিতে হতো। বিনয়ের দাদার বিনয়চারণা অনুযায়ী— "...অন্য অনেকের মত বাবা ও ছোট দুই বোনের সঙ্গে পাহাড়-পর্ব্বত ও বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে ভারতে আসে। এই পথে আসতে অনেকেই রাস্তায় মারা পড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনয় ওরা অসুস্থ হলেও প্রাণ নিয়ে ভারতে পৌঁছয়। এই পথে আসতে প্রায় আড়াই মাস সময় লেগেছিল।"[১৯]

ফরিদপুর-জীবন :

তারপর বর্মা-ফের্তা বিনয়ের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হলো পিতৃগ্রাম তারাইল-এর একটি পাঠশালায়। বিনয়দের বাড়ির চৌহদ্দিতেই খুব সম্ভবত পাঠশালাটি অবস্থিত ছিলো। এই পাঠশালাটির দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হলেন তিনি। মজুমদার পরিবারের অনেক কালের আশ্রিতা রেণু বসু (ডাকনাম বুচি; শেষ জীবন ইস্তক বিনয়ের অবলম্বন)-র জবানানুসারে বিপিনবিহারীই সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন দিতেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার পর দুই বছরের মাথায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিনয় প্রথম বিভাগে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার দু'বছর পর ১৯৪৬-এ বৌলতলী হাই ইংলিশ স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হলো।[২০] এই সময়পট সম্পর্কে যথার্থ জানতে হলে আমাদের আরও একবার বিনয়ের বড়দা অনিলবরণের দ্বারস্থ হতে হবে। তিনি লিখছেন— "যাহোক দেশে পৌঁছানোর পর সমস্যা দেখা দিল পড়াশুনার। আমাদের বাড়ী ছিল পূর্ব্ববঙ্গের এক অজ পাড়াগায়ে। নিকটে কোনো ভাল স্কুল ছিল না। আমার বড় মামা ছিলেন একজন স্কুলের শিক্ষক। বিনয়কে সেই স্কুলেই ভর্ত্তি করে দেওয়া হল। মামাবাড়ী থেকে পড়াশুনা করতে হবে। বিনয় যে ভবিষ্যতে ভাল ছাত্র হবে এখানেই তার আভাস পাওয়া যায়। বিনয় বাড়ীতে তেমন পড়াশুনা করতনা। আর বড় মামা ভাবতেন আজ স্কুলে গিয়ে যদি পড়া না পারে তবে খুব করে মার লাগাবেন। কিন্তু স্কুলে গিয়ে পড়া জিজ্ঞাসা করলে বিনয় উত্তর দিয়ে দিত।"[২১] গোপালগঞ্জ শহরের কাছেই ছিলো উক্ত স্কুলটি। ১৯৪৬-৪৭-এ সেখানে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে মামাবাড়িতে থাকা শুরু করলেন বিনয়। অবশ্য অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই স্কুলের হস্টেলের আবাসিক হলেন। তার আগে থেকেই তাঁর বড়ো দুই দাদা লেখাপড়ার সূত্রে ওখানকার বাসিন্দা। বোর্ডার সব মিলিয়ে মোট কুড়ি জন। অনিলবরণের স্মৃতিতে— "হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে বিনয় ছিল সবচেয়ে ছোট। ওখানে ও স্ট্যান্ড করত। বিশেষ করে অঙ্কে ও অত্যন্ত ভাল ফল করত। এখানে থাকতে ওর চরিত্রের আর একটা দিক জানা যায়। সেটা হচ্ছে পর অভিনয় ক্ষমতা। ওখানে যে বাৎসরিক

নাটকের অভিনয় হত তাতে ও ভাল অভিনয় করত। একবার এক খঞ্জের ভূমিকায় ওর অভিনয় দেখে প্রধান অতিথি যিনি ছিলেন তিনি মন্তব্য করেছিলেন— "একমাত্র খঞ্জের ভূমিকায় যে ছেলেটি অভিনয় করেছে তার অভিনয়ই স্বাভাবিক হয়েছে।"[২২]

বিনয় মজুমদারের প্রসঙ্গকথায় এই বৌলতলী স্কুলটির নাম বিশেষ কারণে জড়িত হয়ে আছে। এই স্কুলের ম্যাগাজিনেই তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রণের রাজ্যে পা দেয়। ভারতের স্বাধীনতাকালে বিনয়ের বয়েস তেরো। তাঁর কাছে তখন স্বাধীনতার মানে বলতে পড়াশোনার মধ্যে চুরি করে কবিতা লেখা।[২৩] প্রথম লিখিত কবিতাটি সম্পর্কে বিনয়ের স্বীকারোক্তি এরকম— "...১৯৪৭ সালে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হবে, অবিলম্বে ছাত্রগণ লেখা জমা দাও।

"বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো ছাত্রাবাসের সবাই কাগজ-কলম নিয়ে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লেখায় মনোনিবেশ করেছে। বলা বাহুল্য, এইসব ছাত্রের কারোই লেখা অভ্যাস ছিলো না। বিদ্যালয়ের পত্রিকা প্রকাশিত হবে, শীঘ্র লেখা দাও— এই বিজ্ঞপ্তি পড়ার পর প্রতি বছরই ছাত্রগণ দিন পনেরো লিখতো। আমিও কাগজ-কলম নিয়ে ব'সে গেলাম। কবিতা লেখার চেষ্টা করলাম। সে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ। আমার জন্ম হয় ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। এই কবিতাটিই আমার রচিত প্রথম কবিতা এবং কবিতাটি ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের বৌলতলি বিদ্যালয়ের ছাত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

"এরপর থেকে আমি কোনোদিন আর লেখা থামাইনি। অর্থাৎ বছর তিরিশ যাবৎ লিখছি। প্রধানত কবিতাই লিখছি। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের বৌলতলি বিদ্যালয়ের ছাত্রপত্রিকায় আমার আরেকটি কবিতা প্রকাশিত হয়।..."[২৪] অর্থাৎ প্রথম লিখিত কবিতাটিই যে তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু, মুদ্রিত কবিতাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মুদ্রিত কবিতাটি কারওর সংগ্রহেই নেই বলে কবি নিশ্চিত করেছিলেন একটি সাক্ষাৎকারে— "সাম্প্রদায়িক কারণে কারা যেন সেই স্কুলটিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। পত্রিকাগুলো পুড়ে গেছিল। তাই লেখাটা কারো কাছে সংগ্রহে নেই।"[২৫] বিনয় মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত কবিতাটি সংগ্রহের জন্য 'অধরা মাধুরী' পত্রিকার সম্পাদক বোধিসত্ত্ব রায় মহাশয়ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের বৌলতলী স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু বৌলতলী স্কুলের গ্রন্থাগারিক তাঁকে দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়েছেন— '৭১-এর যুদ্ধে পাক সেনারা স্কুলের লাইব্রেরীটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ কবিতাটি চিরতরে হারিয়ে গেছে।[২৬] ফলে কবিতাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই রইলো না। রক্তাক্ত দেশভাগের পর ১৯৪৮ খ্রিঃ-তে পুনর্বার উদ্বাস্তু মজুমদার পরিবার পূর্ব বাংলার থেকে

রওনা হলেন পশ্চিম বাংলার উদ্দেশে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগ্রাম মহকুমার গাইঘাটা থানার অধীন শিমুলপুর গ্রামে বিনয়দের নতুন বসতি নির্মিত হয়। অনেক পরে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় জানাচ্ছেন— "আমার বাবা ১৯৪৮ সালে এখানে এসে প্রায় এগার বিঘার মতো জমি কিনে এই ছোট্ট বাড়িটা তৈরি করেন। তখন এক বিঘা জমির দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা। এখন ঠাকুরনগর স্টেশনটি তৈরি হয়েছে প্রাক্তন এম. পি. ঠাকুরবাবুর প্রচেষ্টায়। লোকও বেড়েছে অনেক স্টেশনের কল্যাণে এখন জমির দাম কুড়ি হাজার টাকা বিঘা। এই তো সেদিন বাবা দু বিঘা জমি বিক্রি করে দিলেন।"[২৭]

কোলকাতা-জীবন :

ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে বিনয় মজুমদার কোলকাতায় চলে আসছেন। বিনয়ের জীবনের সব চেয়ে রঙিন, সব চেয়ে বিতর্কিত, সব চেয়ে তথ্যবহুল অধ্যায় এটি। তালতলার হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ারে ভাড়া করা ঘরে তাঁর নতুন জীবন শুরু হলো। ১৯৪৯ খ্রিঃ-র জানুয়ারি মাসে বিনয় ভর্তি হলেন ক্রিক রো-য় অবস্থিত মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউট— বউবাজার শাখায়, অষ্টম শ্রেণিতে। বিনয়রাই ম্যাট্রিকুলেশনের শেষ ব্যাচ।[২৮] কিন্তু ভর্তির পর বিনয়ের মনে হলো যে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হলে তাঁর পক্ষে ভালো হতো। বড়দা অনিলবরণের স্মরণের সরণি বেয়ে আমরা জানতে পারছি যে, বিনয়ের জেদের কাছে নতি স্বীকার করে বিনয়ের বাবা উক্ত স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নকুল রায় মহাশয়কে অনুরোধ করলে তিনি সামান্য মেধা পরীক্ষা নিয়ে বিনয়কে নবম শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন। বছরের মধ্যভাগে ভর্তি হয়েও ধীমান বিনয় ওই শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় তৃতীয় স্থানাধিকার করেছিলেন।[২৯] কোলকাতা জীবনের গোড়ার কথা বিনয় আমাদের জানাচ্ছেন— "আমি যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমার বয়স অল্প— চোদ্দ বছর। একটি বাঙাল আমি। কলকাতার ভাষা শিখতেই গেলো কিছুদিন। বিকালবেলা স্কুল ছুটির পরে আমরা জনাকয়েক সহপাঠী একসঙ্গে বেড়াতে বেরোতাম। রবিবার হলে তো আরো ভালো। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকজন বেড়াতাম মধ্যকলকাতাতেই প্রধানত। সেই বয়স থেকেই আমি সাহিত্যিকদের খুব শ্রদ্ধা করতাম। কোনটা শৈলজানন্দের বাড়ি। কোনটা তারাশঙ্করের বাড়ি এসব আমাকে বলতো অশোক চট্টোপাধ্যায়।... আমরা কাউকে না-জানিয়ে সাহিত্যিকদের বাড়ি দেখতাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'আই হ্যাজ' বইখানির লেখক কেদার চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি দেখতাম বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রামমোহন লাইব্রেরিতে যাবার রাস্তা ছিলো পার্শিবাগান লেন। সুতরাং লাইব্রেরিতে যাওয়ার পথে দেখতাম একটি বাড়ির দরজায় লেখা রাজশেখর বসু।"[৩০] সে-সময়কার কোলকাতায় আর যাই হোক না কেন, গ্রন্থাগারের অভাব

ছিলো না কোনও। বইপ্রিয় বিনয় 'তালতলা সাধারণ পাঠাগার'-এর সদস্যপদ নিলেন। দৈনিক একখানা করে বই পড়ার পাশাপাশি স্বীয় কবিতাচর্চাও চুটিয়ে চলতো বলে বিনয় নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। তালতলা সাধারণ পাঠাগার থেকে এনে বিষ্ণু দে-র 'চোরাবালি' নামক কাব্যগ্রন্থটি পড়ে ফেলেন বিনয়, সঙ্গে সুকান্ত-র 'ছাড়পত্র', সত্যেন দত্ত-র 'কাব্যসঞ্চয়ন', নজরুলের 'অগ্নিবীণা' ইত্যাদি বইগুলি কিনে ব্যক্তিগত সংগ্রহটিকেও সুসজ্জিত, শোভন ও স্বাস্থ্যবান করে তোলেন।[৩১] এরপর থেকে যত দিন গেছে, বিনয় ও বই পরস্পর পরিপূরক, দোসর ও সমার্থক হয়েছে। পার্থিব মৃত্যুর অনতিঅতীতে 'আমরা দুজনে মিলে' কবিতায় (কাব্যগ্রন্থ— 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ') তো গ্রন্থের বন্ধনহীন গ্রন্থিতেই বিনয় তাঁর কল্প (প্রকল্প!)-'সে'-কে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইবেন! দশম শ্রেণিতে পড়াকালীন বিনয় সারা কোলকাতা শহর একা-একা ঘুরে বেড়াতেন, কলেজ স্ট্রিটের সারবাঁধা বইয়ের দোকানগুলি ছুঁয়ে যেতেন চেতনে, অবচেতনে। পুরনো বইয়ের ধুলো ঘেঁটে দুঃখিনী বর্ণমালার অভ্যন্তরস্থ আনন্দসম্ভার ঝিনুকভাঙা মুক্তোর মতোই সযতনে তুলে আনতেন। বইপাড়ার অনেকের সঙ্গেই তখন বিনয়ের প্রাথমিক আলাপচার ঘটে গিয়েছিলো। চোখের সামনে ঐতিহাসিক সিগনেট বুক শপ উদ্বোধনের চাঞ্চল্যের শরিকও তিনি হয়েছিলেন।[৩২]

মেট্রোপলিটনের বাংলার শিক্ষক গৌরী মুখোপাধ্যায়ের (শ্রীযুক্ত গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়, সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক শংকর তথা মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের ভাই)[৩৩] আশ্চর্য পাঠদানশৈলী বহু-বহুদিন বিনয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলো। কিন্তু, নিদেনপক্ষে একটি ছাত্রপত্রিকা না থাকার আপসোস বিনয়কে কুরে কুরে খেয়েছে।[৩৪] সমসাময়িক আরও একটি তথ্য তাঁর অতীতবিহারে মিলেছে। বিনয় লিখছেন— "তখন কলকাতার স্কুলে পড়ি। মাস্টারমশাইরা ঘোষণা করলেন যে স্কুলের একটি ম্যাগাজিন বেরোবে। ছাত্রদের কাছে লেখা চাইলেন। আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম; তার একটি পঙক্তি এখনো মনে আছে— 'ভিজে ভারি হলো বেপথু যুথীর পুষ্পসার'। মাস্টারমশাই-এর হাতে নিয়ে দিলাম। তিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিন্তু, কী জানি কেন, সে ম্যাগাজিন আর শেষ পর্যন্ত বেরলো না।"[৩৫] স্পষ্ট নামোল্লেখ না থাকলেও এই মাস্টারমশাই বিনয়ের প্রিয় গৌরীবাবুই হওয়ার কথা। গৌরীবাবুর মুখ থেকে মেট্রোপলিটনেরই ছাত্র (তিনি যখন ভর্তি হন, ততদিনে বিনয়ের স্কুল-জীবন শেষ) অজয় নাগ মহাশয় বিনয়ের স্কুল-জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানতে পেরেছিলেন— "স্কুলে অনেক গল্পের নায়ক ছিলেন বিনয়। যেমন বিনয়ের ব্যাগে শুঁয়াপোকা থাকত প্রজাপতি হওয়ার অপেক্ষায়, এবং পাশপাশি মজুত স্নো-পাউডার-কচিপাতা শিমূল গাছের কিশলয় নিশ্চয়ই শুঁয়াপোকার খাদ্য হিসাবে, কিন্তু কসমেটিক কিসের জন্য! অঙ্কের স্যারের সঙ্গে একদিন তর্ক বাঁধে সমাধান নিয়ে, শেষ পর্যন্ত বিনয়ই সঠিক, এই ঘটনায় বিনয় স্কুলের আদরের হয়ে

উঠেছিলেন।”[৩৬] এরপর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষি ম্যাট্রিকুলেশনের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেলে বিনয় বড়দার আমহার্স্ট স্ট্রিটের মেসে উঠে আসেন। তখন স্কুলে হাজিরার কড়াকড়ি নেই। তালতলা লাইব্রেরির সদস্যপদ ছেড়ে এবার ‘রামমোহন লাইব্রেরি’-র সভ্য হন তিনি।[৩৭] বিনয় বলছেন— “আমি যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি, মনে হচ্ছে, তখনি সিগনেট বুকশপ নামক দোকানটি সবে খুললো। আমি তখন দৈনিকই বিকালবেলায় ঐ দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম। তখন দোকানের মালিক দিলীপবাবু নিজেই দোকানে ব’সে বই বিক্রি করতেন। কী ক’রে যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলো ঠিক মনে নেই। বোধ হয় বই কিনতে গিয়েই প্রথম আলাপটা হয়েছিলো। আমি প্রায় দৈনিক একখানা ক’রে কবিতার বই তাঁর কাছ থেকে কিনতাম। রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাছা বাছা কবিদের অনেক বই কিনে ফেললাম, প’ড়েও ফেললাম সব। অথচ কোনো কারণে, সে বইগুলি মনে বিশেষ সাড়া জাগাতো না। বয়স কম বলেই হয়তো অমন হতো।”[৩৮]

ম্যাট্রিকুলেশনে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাঠক্রমে ভর্তি হলেন বিনয়। কলাবিভাগে ভর্তি হওয়ার ষোল আনা ইচ্ছে চাপা পড়ে গেলো একপ্রকার পারিবারিক চাপেই। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগেই তাঁর নাম উঠলেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আবশ্যিক ও অতিরিক্ত গণিতে লেটার মার্কস পাওয়াই হলো তাঁর কাল! কবির মৃত্যুর পর বিনয়লিখনে বসে বড়দা অনিলবরণ তাঁদের সেদিনকার সিদ্ধান্তের ভুলচুক মেনে নেন— “অংকে খুব ভালো ছিলো বলে আমাদের মনে হয়েছিলো সাইনস পড়াই ঠিক হবে। কিন্তু আমাদের যে ভুল হয়েছিলো তা বিনয়ের পরবর্তী জীবন দেখলেই বোঝা যায়।”[৩৯]

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার অব্যবহিত পরে বিনয় ইডেন হিন্দু হস্টেলে উঠে আসেন। এই সময়ে তিনি সমস্ত পুরাতনী ছেড়ে নব্যসভ্য হলেন ‘ক্যালকাটা বুক ক্লাব’-এর। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা দু’বছর বিনয় ছিলেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিক। এই প্রেসিডেন্সি ও হিন্দু হস্টেলজীবনে কাটানো সোনালি সময় ব্যক্তি বিনয় ও কবি বিনয়কে বিশেষ তাৎপর্যে বেঁধেছিলো। সে প্রসঙ্গ যথাসময়ে আসবে। তখন হাসিখেলায় নিয়ম করে চলছে পদ্য লেখা। বিনয় স্মৃতিচারণা করছেন— “স্কুল ছেড়ে কলেজে এসে ভর্তি হলাম। এবং আমার কবিতা লেখার পরিমাণও কিছু বাড়লো। আমার একটি খাতা ছিলো। ডবল ক্রাউন সাইজের, চামড়ায় বাঁধানো, কাগজের রঙ ইটের রঙের মতো। খাতাটি খুব মোটা। আমার সব লেখাই এই খাতায় লিখতাম। স্কুলে কবিতা লিখতাম ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু কলেজে উঠে নিয়মিত লিখতে শুরু করি। লিখতাম বেশ গোপনে গোপনে, যাতে কেউ টের না পায়। কারণ আমি কবিতা লিখি— এ-কথা কেউ বললে খুব লজ্জা হতো আমার। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। ফলে অন্যান্য আবাসিকরা শীঘ্রই জেনে ফেললো যে আমি কবিতা লিখি। আমার

ঘরে দুটি সিট ছিল। আমার রুম-মেটই বোধ হয় ফাঁস করে দিয়েছিলো খবরটা। আমাদের রান্নাঘরের দেওয়ালে একটি নোটিশ বোর্ড লাগানো ছিলো। হস্টেল কর্তৃপক্ষের নোটিশগুলি ঐ বোর্ডে আঠা সেঁটে দিয়ে দেওয়া হতো। কিছুদিনের ভিতরেই ঐ নোটিশ বোর্ডে আমার লেখা কবিতাও সেঁটে দিতে লাগলাম— সবগুলিরই বিষয়বস্তু হস্টেলের খাবার-দাবার সম্বন্ধে ছাত্রদের অভিযোগ। সবই হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট সম্পর্কে লেখা ব্যঙ্গ কবিতা। প'ড়ে ছাত্ররা কিংবা সুপারিনটেনডেন্ট যে প্রশংসা করতো তা নয়। ডালে কেন ডাল প্রায় থাকেই না, কেবল জল, মাংস কেন ঘন ঘন খেতে দেওয়া হয় না— এই সবই ছিলো নোটিশ বোর্ডে সাঁটা কবিতার বিষয়বস্তু। আমার অন্য কবিতা গোপন ক'রে রাখতাম।

"কলেজে একটি দেয়ালপত্রিকা ছিলো। খুব সুন্দর হাতের লেখায় শোভিত হয়ে পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোতো। হস্টেলে আমি ভিন্ন আর কেউ কবিতা লিখতো না, কিন্তু কলেজে লিখতেন অনেকে। তাঁদের লেখা মাঝে মঝে কলেজের দেয়ালপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। আমার লেখা কবিতা কিন্তু কখনো এ-দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। কলেজের একটি ছাপা বার্ষিক সাহিত্য সঙ্কলনও ছিলো। তাতেও আমার কবিতা কখনো প্রকাশিত হয়নি।

"সেই সময়ে আমার সব কবিতায় মিল থাকতো। মিলগুলি অনায়াসে মন থকে বেরিয়ে আসতো। তার জন্য একটুও ভাবতে হতো না। কবিতা যখন লিখতাম তখন মনে হতো আগে থেকে মুখস্থ করা কবিতা লিখে যাচ্ছি, এত দ্রুত গতিতে লিখতে পারতাম। এক পয়ার ভিন্ন অন্য সব ছন্দেই লিখতাম। কবিতাগুলির বিষয়বস্তুও ছিলো বিচিত্র, প্রায় সবই কাল্পনিক। দু-একটা বিষয়বস্তুর অংশ আমার এখনো মনে আছে— চিল্কা হ্রদের ধারে এক সঙ্গিনীসহ ব'সে ব'সে চারিপাশে নিসর্গকে দেখছি বা এক সঙ্গিনীসহ মোটরগাড়িতে ক'রে খুব দ্রুতবেগে চলেছি, মনে হচ্ছে গাড়িটি পৃথিবীর একটি উপগ্রহবিশেষ বা ট্রেনে ক'রে দৈনিক লক্ষ লক্ষ কেরানি কী-ভাবে চাকুরি করতে কলকাতায় আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সময়ে লেখা কবিতাগুলি খুব দীর্ঘ হতো। ছোট কবিতা আমি প্রায় লিখতে পারতাম না।"[৪০]

হস্টেলের নোটিশ বোর্ডে সেঁটে দেওয়া টিপ্পনীমূলক কবিতাগুলিতে ব্যঙ্গচিত্র জুড়ে বিনয় প্রায়শই তাতে অলঙ্করণ করতেন। বস্তুত, ছোট থেকেই আঁকায় তাঁর আগ্রহ ছিলো। পরবর্তীকালে তাঁর ডায়েরির পাতায় কখনও সখনও লেখা ও আঁকা একযোগে স্থান করে নিয়েছে দেখা গেছে।[৪১] বেলাশেষের বেলাভূমে উপনীত বিনয় তাঁর একটি বইয়ের প্রচ্ছদও নিজে করেছিলেন।

'ক্যালকাটা বুক ক্লাব'-এর সদস্য থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় 'অচল' পত্রিকাগোষ্ঠীর

লেখক জ্যোতিপ্রসাদ বসু-র সঙ্গে। সে-সময়কার কথা বিনয় বলছেন— "জ্যোতিপ্রসাদ বসু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। রমাপদ চৌধুরীকেও দেখা যেতো মাঝে মাঝে ক্যালকাটা বুক-ক্লাবের আড্ডায়। তবে রমাপদবাবুর সঙ্গে তখন আমার আলাপ হয়নি।[৪২] আবার অন্য একটি বলালেখায় বিনয় মন্তব্য করছেন— "আমার কবিতার প্রথম সমালোচক রমাপদ চৌধুরী। তখন দশম শ্রেণীতে পড়ি। অনেকগুলো কবিতা লেখা হয়ে গেছলো। কিন্তু কাকে দেখাই আর মতামত নি? শেষ পর্যন্ত, ধরুন, পঁচিশ বছর বয়েসের যুবক রমাপদ চৌধুরীকে দিয়েছিলাম খাতাটা, আমার কবিতার খাতাটা। কয়েকদিন পরে রমাপদ চৌধুরী আমাকে খাতাটা ফেরৎ দিলেন। কিন্তু কোনো মতামত দিলেন না।"[৪৩] ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'কিছু পুরনো স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি তার সতেরো বছর আগে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে লিখিত 'স্মৃতিকথা' নামক প্রবন্ধটির দিকে অজানিতেই সংশয়ের তির ছুঁড়ে দিয়েছে। বোঝা যায়, বিনয় তাঁর স্মৃতির প্রতারণার শিকার।... তখনকার তাঁর বইপড়ার নিয়মমাফিকতা নিয়েও বিনয় আমাদের জ্ঞাত করেছেন। ক্ল্যাসিক ইংরেজি কবিতার বই লাইব্রেরি থেকে এনে পড়তেন। বয়েসজনিত অপরিপক্কতার কারণেই সে-সমস্ত বই তাঁর কাছে তেমন মনোগ্রাহী হতো না— বলছেন একথাও। শুধু রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থটি নিয়ে তাঁর নিঃশেষ ভালোলাগার সূত্রপাত সেইসময়, যা শেষ নিঃশ্বাসপাত অবধি কালক্রম ধরে স্থায়ী হয়েছিলো।[৪৪] 'ইডেন হিন্দু হস্টেল'-এ বিনয়ের রুমমেট ছিলেন ময়মনসিংহের জমিদারনন্দন শ্রীযুক্ত সত্যব্রত চৌধুরী। তাঁর দাদা শ্রীপতি চৌধুরী ছিলেন সে-সময়ের সিনেমার হিরো। (সূত্র : বিনয় মজুমদার; '৪ সূচক কবিতা'; ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-২৩; পৃ : ১৯) কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ তখন অনেক সিনেমার জন্যই গান লিখছেন। সেই সূত্রেই ঘরপড়শী সত্যব্রত-র সঙ্গে বিমলচন্দ্রের আলাপ হয়েছিলো। প্রত্যেক রোববার বিকেলে সত্যব্রতবাবু বিমলচন্দ্রের যদু ভট্টাচার্য লেনের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। এই সত্যব্রতই বিনয়কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বিমলচন্দ্রের সঙ্গে। বিনয় সাক্ষ্য দিয়েছেন— "যদু ভট্টাচার্য লেনের বাড়িতে গিয়ে বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার বিমলদা হয়ে গেলেন। এই প্রথম আমার এক পুরোদস্তুর কবির সঙ্গে আলাপ হলো। আমি তখন দৈনিকই কবিতা লিখি। বয়সও ষোল বছর। বিমলদা অনর্গল কবিতা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সে-সব বক্তৃতা ছিলো মহামূল্যবান। আমার কবিতা মাঝে মাঝে পড়তে চাইতেন। আমি খাতায় লিখে নিয়ে বিমলদাকে দিতাম। এইভাবে চার-পাঁচটি খাতা তাঁকে দিয়েছিলাম। খাতাগুলি আর ফেরৎ আনিনি। বিমলদার বাড়িতে হয়তো আমার কবিতার খাতাগুলি এখনো আছে। বিমলদা একদিন প্রস্তাব করলেন যে তিনি আমার কবিতা ছাপাবেন। আমি ছাপাতে নিষেধ করলাম। বললাম যে কবিতা আরো ভালো না-হলে না-ছাপা উচিত।..."[৪৫] কিন্তু, বিনয়দত্ত একটি সাক্ষাৎকার থেকেই আবার জানা যাচ্ছে বিমলবাবুর

সম্পাদিত ‘বারোমাস’ নামধেয় পত্রিকায় বিনয়ের কয়েকটি কবিতা ছাপা হওয়ার কথাও।[৪৬] খুব সম্ভব কিশোর বিনয়ের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়েই বিমলচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় বিনয়ের কবিতাগুলি ছাপিয়েছিলেন। বিনয়মুগ্ধ ও বিনয়-চর্চাকার অমলকুমার মণ্ডল মহাশয় আমাদেরকে অবহিত করছেন এই বলে যে, বিমলচন্দ্র বিনয়ের ভিতরে উজ্জ্বল সম্ভাবনার বীজ লক্ষ্য করেছিলেন। বিনয়কে স্নেহে-প্রেমে বেঁধেছিলেন বর্ষীয়ান কবি। একাত্তর বছর বয়সে বিমলচন্দ্র স্নেহের বিনয়কে উপলক্ষ্য করে গৌরাঙ্গ ভৌমিক-এর ‘অনুভব’ পত্রিকায় একটি কবিতা লেখেন। ‘বিনয় মজুমদারকে’ শিরোনামক কবিতাটির পঙক্তিগুলি এরূপ— “তারপর বহু বর্ষ/ কালের জোয়ারে ব্যাধি-সমুদ্রে সাঁৎরে একাত্তরে/ পৌঁছে বলছি ‘প্রাণাধিক’ তুমি লেখো, লেখো, শুধু লেখো।”[৪৭]

কিন্তু যে বিশেষ পরিচয় বা অপরিচয় কিংবা না-পরিচয়ের খতিয়ান বিনয়ের জীবননদীর গতিপথ আছড়ে-পিছড়ে বদলে দিলো, স্বল্পমেয়াদী হিন্দু হস্টেলবাসের সময়পর্যায় বিনয়ের জীবনের সঙ্গে গেলো ওতপ্রোত হয়ে, অনিবার্য ইতিহাসেই সে এক নারী। বিনয়ের জবানি অনুযায়ী— “যিনি আমার গুরুদেব ছিলেন বাংলা ভাষা পড়াতেন আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সেই জনার্দন চক্রবর্তীর মেয়ে হল গায়ত্রী চক্রবর্তী। ইডেন হিন্দু হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টও আমি ওই হোস্টেলে থেকেছি দুই বছর। আমি ওই হোস্টেলে থেকেছি দুই বছর। গায়ত্রীর বয়স তখন কত হবে? ১০-১১-১২ বছর। আমার তখন হবে ধরো ১৬-১৭-১৮ বছর। তখন আমি ওকে দেখেছি। এরপর তো হোস্টেল থেকে চলে গেলাম। বি.ই. ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লাম। চাকরি করলাম। চাকরি করার পর বেকার বসে বসে কবিতা লিখলাম। তখন গায়ত্রী বি.এ. পাশ করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ফের দেখলাম। তখন লিখলাম ৭৭টি কবিতা।”[৪৮] আর পরক্ষণেই বিনয়ের হৃদয়ে উল্‌কি হয়ে বসা গায়ত্রী, যেন এক মন্ত্র, কবির চোখের পুকুরে অনিবার অবিশ্রান্ত জলোচ্ছ্বাস তুলে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করার সময়কালে অনেকদিন পর একবার কফিহাউসে চোখের আড়ালে পরিপূর্ণ হয়ে ফোটা গায়ত্রী চক্রবর্তীকে নতুন করে দেখছেন। অতঃপর বিস্ময়বিমুগ্ধ বিনয় “সেই বাচ্চা মেয়েটি, সেই কিশোরীটি”[৪৯] বলে বিমূঢ় হচ্ছেন সাক্ষাৎকারে। তাঁর ক্রমবর্ধমান মুগ্ধতা, না-বলা বাণীর আকুলতা জন্ম দিচ্ছে ‘ফিরে এসো, চাকা’-র প্রবাদপ্রতিম পঙক্তিমালার। ‘গায়ত্রীকে’ নামক কাব্যগ্রন্থের ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণে ৬৯ সংখ্যক কবিতায় একটি ‘সুকিশোরী’-র কথা বিনয় বলছেন। মৃত্যুর ক-দিন আগে লিখিত ও জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত একটি কবিতায় গায়ত্রীর ইডেন হিন্দু হস্টেলের গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে হস্টেলের মাঠ দিয়ে কোনাকুনি সোজা বাবার বাড়ির দিকে চলে যাওয়ার কথা লেখেন বিনয়। পরিণামে “আমরা সে হস্টেলের আশ্রমিকগণ/ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম/ তুমি লাজে মুখ ঢেকে বই দিয়ে চলে যেতে একা/ আমাদের সকলের গায়ত্রী কিশোরী।”[৫০] মরণোত্তর

প্রকাশ 'ঘ্রাণ' কবিতায় কবি বহু পরিচিতা গায়ত্রীর মণিতে কফি হাউস আঁকা হয়ে আছে দেখেন।[৫১] তবু, গায়ত্রী-বিনয় আখ্যানে উগ্র পল্লবিতা থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা, বিনয় বারংবার নানাবিধ পরস্পরবিরোধী কথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত (সচেতনে?) করে গিয়েছেন। যে বিনয় এক জায়গায় গায়ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা কখনও হয়নি বলে দাবি করছেন,[৫২] সেই তিনিই অন্য একটি সাক্ষাৎকথনে বলছেন— "আমি যখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম...তখন ওর বয়স ১২। তখন থেকে দেখেছি। পুরোহিতের মেয়ে তো। বেশি কথাবার্তা হয়নি। আলাপ-আলোচনা হত। কবিতা নিয়ে। 'কবিতা লিখেছি কবে, দুজনে চকিত চেতনায়'— এবারে বুঝলে তো!"[৫৩] ইত্যাদি-প্রভৃতি। অবশ্য, কবিরা তাঁদের মনোলীনাকে নিয়ে বরাবর একটু ধোঁয়াশা বা হেঁয়ালির পক্ষপাতীই বটে। বনলতা সেন, রুবি রায়, নীরা, মনীষা প্রমুখ নারী কাব্যভুবনেই সংসার পেতে সারা, জ্যান্ত রন্ধনশালার প্রয়োজন সেখানে পড়ে না। বনলতা সেন নাম্নী নারীকে নামকবিতাটি বাদে জীবনানন্দেরই দু-একটি কম খ্যাত অন্য কবিতা, কবিতার খশড়া ও একটি উপন্যাসে ('কারুবাসনা') খুঁজে পাওয়া যায়; 'নারী' ও 'রানি' শব্দদুটির সংশ্লেষে 'নীরা'-র উৎপত্তি বলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং মন্তব্য করেছিলেন একবার— ব্যস এটুকুই। ঠিক তেমনই সুবিখ্যাত 'চাকা' (গায়ত্রী চক্রবর্তী?) প্রসঙ্গে কিছুটা লোকমুখে শোনা, কিছুটা আমাদের বানিয়ে নেওয়া, কিছুটা বিনয়নির্মিত বিভ্রম। তবে 'চাকা'-র রাজ্যে প্রবেশের পূর্বে গায়ত্রী চক্রবর্তী-র (তখন তিনি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, ভুবনবিখ্যাত তাত্ত্বিক জাঁক দেরিদা-র প্রিয় ছাত্রী ও 'Post Colonial Theory'-র অন্যতম প্রবক্তা) একটি সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন। গায়ত্রী জানিয়েছেন— প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলার অধ্যাপক বা হিন্দু হস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট জনার্দন চক্রবর্তী নন, তাঁর বাবার নাম পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, পেশা চিকিৎসা। তাঁর মৃত্যুর সময়পর্বে গায়ত্রী তখন তেরো বছরের সদ্য কিশোরী।[৫৪] অতএব বাবার মৃত্যুর পর কোনও জোরালো পরিচয়ের সুবাদে তিনি জনার্দনবাবুর কাছে পালিত হয়েছিলেন— এই মর্মে ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। আর সেটাই বুঝি বা বিনয় মজুমদারের ভ্রান্তির নিহিত কারণ।

১৯৫৩-য় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি. পাশ করে বিনয় তৎকালীন 'শিবপুর বি.ই. কলেজ'-এ (অধুনা 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি', সংক্ষেপে 'বেসু') মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হলেন। ঘটনাচক্রে সে-বছরটা শিবপুরের শতবার্ষিকী।[৫৫] তাঁর "...স্পেশাল সাবজেক্ট ছিল প্রোডাকশান ইঞ্জিনিয়ারিং— এ-ও বোধহয় মার্কসবাদেরই প্রভাব— Production Relation-ই তো সব থেকে বড় কথা।"[৫৬] ততদিনে জ্যোতিপ্রসাদবাবুর সংস্পর্শে এসে বিনয় কমিউনিস্ট মতাদর্শে আস্থাশীল হয়ে পড়েছেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে নাম কিনছেন যেমন, কলেজের স্টুডেন্ট্স ইউনিয়নের

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির পদও করছেন অলংকৃত। বিনয়ের বড়দা অনিলবরণ বিনয়ের ইউনিয়নের সেক্রেটারী থেকে প্রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হওয়া বিষয়ক একটি তথ্য[৫৭] দিলেও এর অন্য কোনও সমর্থনসূত্র আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়নি। বিনয়ের দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিক্ষিপ্ত কিছু শব্দবন্ধ মিলেছে মাত্র— "সেখানে আ-আ-আমরা, তিনজন আমাদের একটা, (হেসে) ইউনিয়ন গড়া চলে না, ঠিক কিনা, অ্যাঁ? (গাড়ির শব্দ, অস্ফুট, জড়িত কথা) প্রেসিডেন্ট হবে একজন অধ্যাপক, আর জেনারেল সেক্রেটারি একজন ছাত্র, অ্যাঁ? আমাদের ইউনিয়নের আইন হল কী, কেবল অধ্যাপকদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি সমস্ত ছাত্রদের ভেতর থেকে হবে। আমাকে ওরা প্রথম প্রেসিডেন্ট করল! আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম প্রেসিডেন্ট!..."[৫৮] বিনয়ের কথাগুলি এতই অসংলগ্ন যে, তা কোনও সঠিক নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করতে পারছে না। শিবপুর অধ্যায়ে কোন ভুলে ভুলে প্রেসিডেন্সি অনুপ্রবেশ করে গেছে! শুধু বিতর্ক না বাড়িয়ে এটুকু বলাই যায়, সক্রিয় ছাত্ররাজনীতিতে অংশ তিনি নিয়েছিলেন তো বটেই, অধিকন্তু অল্প দিনের মধ্যেই নেতৃত্বের ব্যাটনও তাঁর হাতে চলে এসেছিলো। এর মধ্যে তাঁর পড়া শেষ হয়ে গেছে 'ডাস ক্যাপিটাল'। একটি সাক্ষাৎকারে রাজনীতিমনা বিনয়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে— "সে সময়টা বড় অদ্ভুত সময় ছিল। মার্কসবাদ সম্বন্ধে লেখাপড়া মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা প্রায় একটা ফ্যাসানের মতোই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল— বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে Serious Commitment or Sincere Conviction কতটা ছিল তা বুঝতেই পারি আজ ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের চেহারা দেখেই। চীনের পার্টি আর আমাদের পার্টির জন্ম প্রায় একই সময়ে— ওরা কোথায় আর আমরা কোথায়! কী করেই বা হবে?— ভাবা যায় কমিউনিস্ট পার্টির (ভারতের) ইতিহাস লেখা হচ্ছে বুর্জোয়া সরকারের জেলে বসে— ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস! একে এক ধরনের অর্ডারি লেখা বলা যায় না কি? আমি নিজে ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে বসে ঘণ্টার পর ঘন্টা প্রুফ দেখে দিয়েছি।"[৫৯] একথা বলার, শিবপুরে ভর্তি হবার আগেআগেই বিনয়ের সঙ্গে কল্লোল কবিগোষ্ঠীর যোগসূত্র রচিত হয়েছিলো। এমনকি, অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গেও বিনয় পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণু দে-র সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় বিনয়ের তিন-চারটি কবিতা ছেপে বের হয়েছিলো। বিষ্ণু দে-র বাড়িতে বিনয় মাঝেসাঝে যেতেন এবং এই আলাপচারই কবিতা ও বিনয়ের ঘনিষ্ঠতাকে অন্যতর মান্যতা দিয়েছিলো[৬০] বলে গবেষক অমলকুমার মণ্ডল আমাদের অবহিত করলেও বিনয়ের অতীতচারণ কিন্তু এর সময়সারণি নিয়ে ভিন্ন কথা বলছে। বিনয়স্মরণে— "তারপরে কলেজে শিক্ষা শেষ ক'রে আমি চাকরি পাই অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ (১১০ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা) নামক প্রতিষ্ঠানে। অধ্যাপনার কাজ। তখন বিকালে ছুটির পরে বাড়ি ফেরার পথে দৈনিক একবার কফি হাউসে গিয়ে হাজির হতাম।

এবং তৎকালীন বহু তরুণ কবির সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়। আরো বহু কবির সঙ্গে আলাপ হয়। এই আলাপের ফলে ধীরে ধীরে কবিতার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

"এই সময়ে বিষ্ণু সে-র বাড়িতে যেতাম মাঝে মাঝে। নিজের কবিতার খাতা তাঁকে দিয়ে আসতাম। বিষ্ণু দে আমার তিন-চারটি কবিতা তাঁর সাহিত্যপত্র নামক পত্রিকায় ছাপেন।..."[৬১] আবার অমলবাবুর দেওয়া তথ্য অনুসারে বিনয় "বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যানুয়াল সিলভার জুবিলি নাম্বার (১৯৫৬-৫৭) অর্থাৎ 'বেকা' নামক একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ওই কলেজের স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। তাঁর এই সভাপতিত্বের কালে কলেজের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছিলো। সে উপলক্ষে যে স্যুভেনিয়ার বের হয়েছিল, তাতেও ছিল বিনয়ের বলিষ্ঠ ভূমিকা। শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত এক সাহিত্যসভায় বিনয়ের ডাকে বিষ্ণু দে এসেছিলেন।[৬২] বিনয়-বিষ্ণু নৈকট্য ঠিক কবে থেকে, তার নিখুঁত হিসেব দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না। কোনও ক্ষীণ প্রাক্-আলাপ শিবপুরের সাহিত্যসভাকে কেন্দ্র করে আরও গাঢ় হয়ে থাকতে পারে। তবে বিনয়ের প্রথমদিক্‌কার কবিতাভাষ্যে বিষ্ণু দে-র প্রভাব স্পষ্ট। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ইডেন হিন্দু হস্টেলে থাকাকালে বিষ্ণু দে-আচ্ছন্ন বিনয়ের একটি কবিতার ভাষা এমনই— "তোমায় যে দিন/ তোমায় যে-দিন পেয়েছি সে-দিন/ প্রাকস্মারণিক নয়/ ইতিমধ্যেই শিথিল আলিঙ্গন।/ ওষ্ঠ-নয়নে কামনা আলিম্পন/ মদিরেক্ষণা, কই?/ আনো না এখন যখন-তখন/ সাদর সম্ভাষণ/ অনুপ অমিয়ময়।..." এ ভাষা ও ভাব বিনয়ের স্বধর্মী নয়। কবিতাটি 'শিলীন্ধ্র' কর্তৃক প্রকাশিত বিনয়ের 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমগ্র কাব্যগ্রন্থটি 'প্রতিভাস' প্রকাশিত বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র ২য় খণ্ডে স্থান পেয়েছে।... সে যাই হোক, সকলের ইচ্ছেয় শিবপুরের হস্টেলের নিজস্ব বইপত্তর সামলানোর দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়। বি.ই. কলেজের ছাত্রজীবনেই তাঁর কিছু লেখা প্রথম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিলো বলে বিনয় জানাচ্ছেন, জানাচ্ছেন সেগুলি হারিয়ে ফেলবার কথাও। তাঁর লেখা বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয় এই সময়ে।[৬৩]

বি.ই. কলেজে ছকবাঁধা পড়াশোনার বাইরে অন্য কোনও বিষয়ে মনোনিনেশ করার সময় বিনয়ের হয়নি। বছর দুয়েক তাঁর কবিতা লেখা বন্ধই ছিলো প্রায়। তথাপি এই সময়কাল বিনয়ের ভবিষ্যকবিতা কোন পথে এগোবে, তার একটি ধাঁচা নির্মাণের সহায়ক হয়েছিলো। বিনয় নিজে মনে করেছেন— "কবিতা লেখার অন্যতম প্রধান ব্যাপার হচ্ছে একটি ভালো বিষয়বস্তু মনে আসা।"[৬৪] কিন্তু, বিনয়ের সমস্যা ছিলো এই যে, বর্ণনাত্মক ঢঙে নিসর্গকথা তাঁকে টানেনি তখন। প্রেসিডেন্সির বিনয় বলেছিলেন— "শহরের দৃশ্যাবলী— পথ ঘাট মাঠ

বাড়ি— এ-সকল আমার কবিতার বিষয়বস্তুতে আসতো না। মাঝে মাঝে গ্রামে আসতাম। গ্রামের দৃশ্যাবলীও আমার বিষয়বস্তু হতো না। অর্থাৎ কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি সেই বয়সেই লিখতে পারতাম না।"[৬৫] সেই রেশ ধরেই শিবপুরের বিনয় বলছেন— "গঙ্গার ধারে কলেজ, পাশেই বোটানিক্যাল গার্ডেন। নদীর পাড়ে বিরাট এক কাঠগোলা। আন্দামান থেকে জলপথে নিয়ে আসা বিশাল বিশাল সব কাঠের গুঁড়িতে নদীর পাড় ঢাকা। সেখান থেকে গঙ্গার দৃশ্য অপূর্ব। কিন্তু কেবল বর্ণনামূলক কবিতা আমি তখনো লিখতে শিখিনি। ফলে সেই কলেজে থাকাটা আমার কাব্যচর্চার ভিতরে বিশেষ স্থান পায়নি।"[৬৬] বিনয়ের স্মরণানুগ শিবপুর বি.ই. কলেজের জীবনে তিনি সবেমোট পঞ্চাশটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কম সংখ্যক সৃষ্টির নেপথ্য কারণ হিসেবে তিনি সময়াভাবের চেয়ে বেশি দায়ী করেছেন কাব্যিক বিষয়বস্তুর অভাবকে।[৬৭] এদিকে বিষ্ণু দে-র প্রভাব অতিক্রান্ত বিনয় তখন জীবনানন্দীয় বলয়ে উলুকঝুলুক করছেন, কবিতায় কড়া হাতের কাটাকুটি করছেন, সুচেতনে করছেন উপমার প্রতীকী প্রয়োগ। কলেজ জীবনান্তে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম প্রণীত 'নক্ষত্রের আলোয়' (দেবকুমার বসু কর্তৃক অধুনালুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে জীবনানন্দানুসারী প্রক্ষেপ মিলবে। তখনও অবধি স্বীয় বয়া খুঁজে পাননি কবি। তার জন্য লেখক ও পাঠক উভয় পক্ষকেই আরও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তবে জীবনানন্দ সম্বন্ধীয় হার্দ বিনতা, সশ্রদ্ধ স্পর্শকাতরতা পঞ্চাশের দশকের অন্য কবিদের মতোই তাঁর কাছেও অনিবার্য ছিলো, মহাপ্রস্থান অবধি ছিলো বহালও। মৃত্যুর বছরে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মানসগতভাবে জীবনানন্দঘেঁষা অবস্থান নিয়ে সহাস্য বিনয় বরঞ্চ সোজাসাপটা জানাচ্ছেন— "দ্যাখো, অনেকের কাব্যে তো শেলী, কীট্স ইত্যাদির প্রভাব পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে আমার কবিতায় যদি জীবনানন্দের মতো কোনো দেশীয় কবির ছোঁয়া পাওয়া যায়, সে তো গর্বের কথা।"[৬৮] আশ্চর্য, এহেন বিনয় "অনেক পরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমার বইয়ের এক সমালোচনায় লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে পারি, এমন কি 'গু গোবর' নিয়েও আমি সার্থক কবিতা লিখতে পারি।"[৬৯] বলায় প্রচ্ছন্ন অহং অনুভব করলেন! সাক্ষ্যস্বরূপ যে প্রবন্ধটির কথা উল্লেখ করেছেন কবি অর্থাৎ হাওড়া থেকে প্রকাশিত অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের 'সম্প্রতি' পত্রিকার তৃতীয় সংকলন— তাতে 'গু-গোবর'-এর কথা থাকলেও কথাটি কিন্তু বিনয়ের 'গায়ত্রীকে'-র সমালোচনায় প্রযুক্ত হয়নি।[৭০] বিনয়ের তথ্যোল্লেখের ভ্রান্তি অমার্জনীয় ব্যাপার নয়। কাব্যবিষয়ক চিন্তনের তারতম্য বিনয়ের কবিজীবনের দুই প্রকট অর্ধাংশকে ধারণ করে রয়েছে, এটাই বলবার। 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র বিনয় এক, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির বিনয় আর-এক, যা কিনা প্রথম অর্ধের বিনয়ের সূর্য পোড়া ছাই! 'ফিরে এসো, চাকা'-র বিনয় প্রত্যক্ষ বস্তুর একঢালা বর্ণনার ভাব ও শৈলীকে তাচ্ছিল্য করতেন।

চেতনাগতভাবে বিনয় বদলাতে শুরু করলেন বি.ই. কলেজজীবন শেষ হওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই, যদিও তার ছাপ দৃষ্টিকটুভাবে পড়া শুরু করে আরও বেশ কয়েক বছর পরে ও পর থেকে। কাব্যাদর্শের পরিবর্তন বিষয়ে বিনয় আমাদের অবগত করছেন এই বলে যে— ‘‘সেই কলেজে পাঠকাল ভাবতাম কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক, আর কিছু বিষয়বস্তু কাব্যিক নয়। এখন আমার কাছে মনে হয় ব্যাপারটা তেমন নয়। সব বিষয়বস্তুই কাব্যিক এবং যাঁর দৃষ্টিতে এই কাব্যিকতা ধরা পড়ে , তিনিই কবি। এমন কি, চিন্তা করার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে যে-পদ্ধতিতে ভাবলে কাব্যিকতা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে কাব্যিকতা লুকিয়ে থাকে, তাকে বের করার জন্য চিন্তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ-সব কথা আমি টের পাই, বুঝতে পারি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের গোড়া থেকে। তার আগে জানতাম না।’’[৭১]... শিবপুরে বাসকালে লিখিত কবিতাগুলিকে খাতাসমেত বমাল হারিয়ে ফেলেছিলেন বিনয়,[৭২] প্রেসিডেন্সিজীবনে লিখিত কবিতাগুলির দশাও অনুরূপ হয়েছিলো, তবু কবির স্মৃতির সিন্দুক ঘেঁটে তার কয়েকটির অংশবিশেষ উদ্ধার করা গেছে। সে প্রসঙ্গ আসবে। কিন্তু, শিবপুর-পরবর্তী বিনয় স্বতাগিদেই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে মরীয়া। গ্রন্থাকারে প্রকাশে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’-কে রাজি করাতে না পেরে সংরক্ষণ করার অনুরোধ জানিয়ে ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’-র মূল পাণ্ডুলিপিটি ডাকযোগে ‘ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি’-তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৭৩]

বিনয় নিজেই এক আত্মকথাজাতীয় রচনায় বলেছিলেন— ‘‘প্রেসিডেন্সি কলেজে যে দুই বছর পড়েছিলাম (হিন্দু হোস্টেলে থেকে) সে সে দুই বছরে যা কবিতা লিখেছিলাম তাতে সহজেই একখানা কাব্যগ্রন্থ ছাপা চলতো। কিন্তু সেগুলি অধিকাংশ হারিয়ে গেছে ব’লে আমার আশঙ্কা। দু’এক পঙক্তি যা এখনো মনে পড়ে তা এই রকম :

‘‘মানস হ্রদের থেকে যে হাঁসেরা এখানে
শীতের তাড়ায় এসে বিলে খোঁজে খাদ্য
তাদের শরীর আমি চেখেছি।

কিংবা, রোদে ঝলসানো সাদা মেঘেরা নিকেল।
শুক্তি দু’ফাঁক ক’রে মুক্তো মুঠোয় আনি সোনালী বিকেল
মুক্তোয় ধরা দেয় স্বর্ণালী রঙ আহা
স্বর্ণালী রঙ

কিংবা, বাইরে আসীন/ মকরধ্বজ/ ঝলমল দিন/ সারা দেশ থেকে/

কেরানি কুড়িয়ে/ ছুটে চলে ট্রেন।

কিংবা, ছল অকরুণ সাহারা/ তবু এ বিতান বাহারা/ রজনীগন্ধা মদিরা/
বিভোল/ নয়নের নীল পাহারা/ রেখে গেছে তবু তাহারা/
বনকুসুমের স্নেহসঞ্চয়/ মিলেছে আমার ঈষিকায়/ মৌসুমী/
মৃগতৃষিকায়।

কিংবা, প্রাগাঢ় আবেগে আঙুলে জড়াই, তন্বী, তোমার তনু।
গীতিকুহরিত দেহান্তে জাগে শ্যামলিন মৌসুমী।

ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হচ্ছে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের আগে রচিত কবিতাসমূহের কিছু পঙক্তি। এখন এই (হয়তো হারিয়ে যাওয়া) কবিতাগুলির প্রতি খুব মায়া হয়।"[৭৪] কবির স্মৃতিবাগে আর কোনও সমসাময়িক লেখন বেঁচেবর্তে নেই। অথচ, যত দিন গেছে, উন্নাসিক ও উদাসীন বিনয়ের বিষয়-নির্বাচনী ক্ষমতা কমে এসেছে, বিষয়বস্তুর আপাত পরিধি বাড়লেও গভীর দৃষ্টিপাতে তা অকৃত্রিম নিসর্গমালিকার নেহাতই টুকরো ফুলসদৃশ বলে প্রতিপন্ন হবে। ফলত, তাঁর রচিত মাঝারিমানের কবিতার সংখ্যা বেড়েছে, দ্বিতীয় কোনও 'ফিরে এসো, চাকা'-র সম্ভাবনামাত্রও আর তৈরি হয়নি।

বি.ই. কলেজে অবস্থানকালে শেষ দুই বছর কিছু কবিতা লিখেছিলেন বিনয়। কাপড়ে বাঁধানো রয়াল সাইজের একটা ঢাউস ডায়েরি জোগাড় করেছিলেন তিনি। কবিতার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়েও কিছু-কিছু লেখাজোকা বিনয় ওই একই খাতায় করতেন। এক পয়ার বাদে অন্যান্য সমস্ত ছন্দেই টানা লিখে যাওয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা তখন তাঁর আয়ত্ত।[৭৫] বিনয়ের ডায়েরির উদ্ধৃত একটি অংশেও বিনয়ের বক্তব্যের ধরন একই— "অথচ এটাও সত্য ১৯৫৯ সালের পূর্বেও হয়তো বা পর পর আমি নানাবিধ ছন্দে কবিতা লিখেছি, যেমন : 'ওবি ইনিসিতে/ বাণ ডেকে যায়/ মোহনা বরফে জমাট থাকে/ চক্ষুকর্ণ/ নাসিকা জিহ্বা/ সহসা আবেগে/ রুদ্ধ হলে.../ বরফের মতন/ মেদ লাবণ্য/ দেহের চূড়ায়/ আলোয় হাসে' ইত্যাদি। সেই যুগে হয়তো বা কিছু গান রচনা করেছি।"[৭৬] ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেকার বিনয়ের লেখাগুলির অস্তিত্ব ও অবস্থিতি তাঁর স্মৃতিপট ছাড়া আর কোথাও ছিলো না। যেটুকু আমরা কুড়োতেকাঁচাতে পেরেছি, তা কবির রোমন্থনের সূত্রে। প্রাক্-শিবপুর পর্ব থেকে শিবপুর পর্বের শেষ অবধি লেখালেখি নিয়ে বিনয় জানাচ্ছেন— "মিল দিতে বিশেষ বেগ পেতে হতো না। মিল যেন আপনিই এসে যেতো। এই কলেজে আসার পর আমি পয়ারে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল

পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে-ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে শুরু ক'রে চার বছর লেগেছিলো আমার পয়ার লেখা শিখতে— 'আবিষ্কার করতে' লেখাটাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিইনি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারই লিখি।"[৭৭]

বলা বাহুল্য, 'পয়ার' বলতে এখানে নিশ্চিতভাবেই 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দকে বোঝাতে চেয়েছেন বিনয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে অনেকেই 'পয়ার' নামে ডেকে থাকেন। কিন্তু ৮+৬ মাত্রা (৪+৪+৪+২) চালের ছন্দকেই পয়ার বলা হয়। পয়ার 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্ত'— এই তিন ছন্দেই লেখা সম্ভব। কিন্তু, কবিতা নিয়ে সিরিয়াস বিনয়, স্বভাব-খুঁতখুঁতে বিনয়, কবিতার পরিমার্জনায় নির্মম বিনয় তখনও অবধি ভেবে উঠতে পারেননি যে একদিন সব ছেড়ে কবিতার কাছেই তাঁকে মাথা কুটে মরতে হবে! বলছেন— "ইঞ্জিনিয়ার হবো— এই ছিলো আমার ইচ্ছা। কবিতা লিখতাম নেহাত ভালো লাগতো ব'লে।"[৭৮] অন্যত্র বলছেন— "কে কী হওয়ার জন্য জন্মায় তা তো দেবা না জানন্তি। আমি নিজেই কোনোদিন কবি হবো ভাবি নি। তবে কবি হয়েছি বলে আমি খুশি।"[৭৯] অগাধ পড়াশোনা ও হরবকত সাহিত্য সৃজনের পাশাপাশি বিনয়ের জীবনে একটি ক্ষণজন্মা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়ও ছিলো। ষাটের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে মাস ছয়েক কাজ করেছিলেন তিনি। কমিউনিস্ট পার্টি তখন যেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। আর স্বপনপসারি আদর্শ মাতিয়ে দিচ্ছে কৃষক, মজদুর, ছাত্র, লেখক, শিল্পী প্রমুখকে। কিন্তু পার্টিকর্মীরূপে আত্মপ্রকাশের আগে বিনয় নিজেকে মনোমজ্জায় প্রস্তুত করে তুলছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তিনি 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর অন্য আলোর ভূখণ্ডে ঘুরছেন-ফিরছেন। ফ্রানৎজ কাফ্‌কা-র 'দ্য ট্রায়াল', জেম্‌স জয়েস-এর 'ইউলিসিস', চার্ল্‌স ডারউইন-এর 'এক্সপ্রেসন অব ইমোশন, ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল'— যে বই ভালো লাগছে, পঁচিশ-ছাব্বিশবার করে নাকি পড়ে ফেলছেন। সেই সঙ্গে লাইব্রেরিতে হাতের নাগালে যা পাচ্ছেন, দেশি-বিদেশি কবিতার বই; বায়রন, শেলি, কোল্‌রিজ, কিট্‌স-এর কালেক্টেড ওয়ার্ক্‌স— গিলছেন গোগ্রাসে।... প্রেসিডেন্সির তৎকালীন প্রিন্সিপাল অতুলচন্দ্র রায়-এর সামনে কিছু মিষ্টি মিথ্যে নিয়ে দাঁড়াচ্ছেন প্রিয় ছাত্র বিনয়, স্তোকবাক্য গঠন করছেন, বলছেন, মার্কসের লেখা "...অধ্যয়ন শেষ করে পড়া উচিত।"[৮০] সেদিনকার ছাত্রজনোচিত মিথ্যাচারের স্বীকারোক্তি করছেন নিজেই— "আমি তখনও পড়তাম, কিন্তু, মুখে বলতাম, স্যার, যদ্দিন আমার পড়াশোনা হচ্ছে, তদ্দিন আমরা, ছাত্রবৎ তপস্যা করছি, পড়াশুনোরই।...

“যদি কোনওদিন আমরা কমিউনিস্ট হই (অস্ফুট) অধ্যাপক প্রিন্সিপাল অতুলচন্দ্র রায়কে বলতাম...কিন্তু সে-ও, পাশ করবার, তিন-চার বছর পরে। আমরা ছাত্র অবস্থায় কেউ রাজনীতি করতে যাব না...।”[৮১]

ছাত্রজীবনে বিনয় বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা ও চর্চায় মাতছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্য রাশিয়া তাঁর প্রথম পছন্দ ছিলো। তাই সে দেশের ভাষা শিখে নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া, ভ্লাদিমির লেনিন-এর রচনাবলি আকর ভাষায় পড়বার বাসনাও রুশ ভাষা শেখায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো বিনয়কে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পিতৃপুরুষ কমঃ মুজাফ্ফর আহ্মেদ-এর কাছাকাছিও তিনি এসেছিলেন এবং মুজাফ্ফর আহ্মেদ তাঁকে ‘ট্যালেন্টেড বয়’ বলে অভিহিত করেছিলেন বলে অমলকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন।[৮২] কিন্তু, কোনও তথ্যসূত্র উল্লেখ করেননি তিনি, আমাদের হাতেও এর স্বপক্ষে আর কোনও লেখাপত্তর এ-যাবৎ পৌঁছয়নি, সে-কারণে এই তথ্যটিকে প্রামাণ্য বলা যেতে পারে কিনা তা বিতর্কের বিষয়। সেদিন রাশিয়ার কমিউনিজমের আঁচ আবিশ্ব ছড়িয়েছে— “ভারতের সঙ্গে তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা ক্ষেত্রে যোগসূত্র রচিত হচ্ছে। গোটা কলেজ স্ট্রিট জুড়ে ছড়িয়ে থাকে অল্প মূল্যের সোভিয়েতের লোভনীয় প্রচ্ছদ, বাঁধাই ও পেপারের নানা গ্রন্থ, পত্রিকা ও রেকর্ড। ট্রেনে, বাসে, ট্রামে পর্যন্ত যে সব বই-পত্র ফেরি করা হচ্ছে। চিরায়ত সাহিত্যের ইংরেজি, বাংলা অনুবাদ কলকাতার দোকানে দোকানে শোভিত হচ্ছে। রুশভাষা শেখানো এবং শেখানোর প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নিসা পোতাপোড়ার লেখা ‘রাশিয়ান’ নামক গ্রন্থটি তখন কলেজ পাড়ায় এক বহু আলোচিত নাম। লেনিনগ্রাদ ইউনিভারসিটিতে গবেষণা করতে আসেন অধ্যাপিকা ভেরা নভিকভা। এমন পরিস্থিতিতে রুশভাষা শেখা ছিল বস্তুত একটি উত্তেজনার বিষয়।”[৮৩]

বিনয়ের মুখ থেকেই শোনা যে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পড়াশোনার, পত্রিকা করা, রাজনীতি প্রভৃতির অত্যন্ত চাপের ভিতরেই হাওড়া শিবপুর থেকে নিয়মিত কলকাতায় এসে রুশ ভাষা দখলে এনেছিলেন তিনি। “তখন মাদাম ওলগা গুসেভা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রুশভাষা শিক্ষণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ছিলেন। অধ্যাপক হেরম্ব মৈত্রের নাতি নিরঞ্জন মৈত্র ‘ভাষা শিক্ষা নিকেতন’ নামে একটি ভাষা শিক্ষার স্কুল খুলেছিলেন। মাদাম গুসেভা সেখানেও রুশভাষা শেখাতেন। বিনয় এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পাশাপাশি বিনয় এখানে টানা চার বছর সমানতালে ভাষা শিক্ষা নিয়েছেন। সেই সময় রুশভাষা শিক্ষা ছিল ভীষণ কষ্টকর বিষয়, কেননা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই ভাষার ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হত। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিনয় তা পেরেছিলেন। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা পারেননি বলে এক বছর পরে সবাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পড়ে থাকেন শুধু একা বিনয়। গুসেভার কথামতো তখন

তিনি আর 'ভাষা শিক্ষা নিকেতন'-এ নন, শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে গিয়েই ভাষা শিক্ষার কাজ ১৯৫৭ সালে শেষ করেছিলেন।[৮৪] মাদাম গুসেভা বিনয়ের অধ্যয়নশেষে তাঁকে জানান— "তোমার আর পড়ার দরকার নেই এখানে। তুমি যা শিখেছ তাতে রাশিয়ায় গেলে এক মাসের ভিতরেই তুমি রাশিয়ান ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি সুতরাং আর আমার কাছে পড়ো না।"[৮৫] বিনয়ের দাবিমতে, তখন গোটা কোলকাতায় রুশ ভাষাবিদ্ ইঞ্জিনিয়ার বলতে এক তিনিই ছিলেন। রুশ ভাষায় পারদর্শী বিনয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিলো, আসতে শুরু করেছিলো অনুবাদকর্মের অনুরোধ। প্রিয়দর্শী ব্যানার্জী নামের এক ভদ্রলোকের সূত্রেই বিনয় নাকি প্রথম অনুবাদকর্মে হাত দেন। এই ভদ্রলোক ছিলেন এক প্রকাশনার মালিক। তাঁর শ্যালক শ্রী সুব্রত সেন, (পেশায় যিনি বটানিক্যাল গার্ডেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ছিলেন)-এর কাছ থেকেই খুব সম্ভবত প্রিয়দর্শীবাবু বিনয়ের রুশ ভাষাজ্ঞানের কথা শুনে থাকবেন। প্রিয়দর্শীবাবুর কথামতো বিনয় বেলা একটার সময় একদিন গঙ্গার ধারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেইদিনই সুব্রত সেন একটি বই বিনয়কে দিয়ে অনুবাদ করে দেবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন। বিনয়ের বলায়— "কথা ছিল ওরা বইটা রুশ গভর্নমেন্টকে দিয়ে দেবেন এবং রুশ গভর্নমেন্ট ছাপবেন।"[৮৬] সে বইটি কোনও অভ্যন্তরীণ কারণে প্রকাশ না পেলেও রুশ সরকারের নেকনজরে পড়ে গেলেন বিনয়।

বেশ কিছু বিজ্ঞানের বই বাংলায় অনুবাদ করার অনুরোধ এল বিনয়ের কাছে তাঁর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রজীবনে। বয়েস তেইশ। ফাইনাল পরীক্ষার আগেই বিনয় এইসব অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'স্মৃতিকথা' (রচনাকাল : ১৯৭৭ খ্রিঃ) থেকে জানতে পারছি, কলেজজীবনের প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণান্তে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ছ'খানা গদ্যগ্রন্থ অনুবাদের কাজ সমাপন করেন। 'ন্যাশনাল বুক এজেন্সি' প্রকাশ করেছিলো তাঁর অনূদিত পাঁচটি বিজ্ঞানের বই ও একটি আত্মজীবনী— ১৯৫৮-য় 'অতীতের পৃথিবী' (উল্লেখ্য, ওই একই বছর 'গ্রন্থজগৎ' থেকে তাঁর প্রথম মৌলিক কাব্য 'নক্ষত্রের আলোয়' প্রকাশিত হয়।), ১৯৫৯-এ 'মানুষ কী করে গুনতে শিখল', ১৯৬১-তে 'সেকালের বুখারায়', ১৯৬২-তে 'সূর্যগ্রহণ' ও 'বায়ুমণ্ডল', ১৯৬৩-তে 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব'। 'সেকালের বুখারায়' বইটি সদ্‌রুদ্দিন আইনীর আত্মজীবনীমূলক লেখা। অন্য বইগুলি মূল রুশ থেকে অনুবাদ করলেও 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' বিনয় অনুবাদ করেন ইংরেজি থেকে। বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। পরে 'আধুনিক বিজ্ঞান' নামক একটি গ্রন্থও বিনয় মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন। 'এন.বি.এ'.-র এই বই তর্জমার সূত্রেই রুশ সরকারের সঙ্গে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে হয়েছিলো বিনয়কে। একটি সাক্ষাৎকার থেকে এই বিষয়ে বিনয়ের মন্তব্য উদ্ধার করা যাচ্ছে— "রাশিয়ান গভর্নমেন্ট...তারপর আমি সেটা

আবার সই করলাম চুক্তিপত্র! চুক্তির এক...চুক্তির এক পক্ষ হচ্ছে রাশিয়ান গভর্নমেন্ট, আর এক পক্ষ আমি, বুঝতে পারছ? (অস্ফুট) টাইপ করা, খুব সুন্দর— রাশিয়ান গভর্নমেন্টের তরফে লেখা আছে যে...অনুবাদ করে দেবেন বিনয় মজুমদার, প্রতি পৃষ্ঠায় সাড়ে তিন টাকা করে পাবে...পাবে...এর পরে, বইয়ের দায়িত্ব, লাভ-লোকসান যত হবে সব রুশ সরকারের, বিনয় এক টাকা পাবে না...চুক্তিপত্রে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক সই করল, আমি আমার সই করলাম। তিনখানা বয়ান, একখানা আমি নিলাম, একখানা রাশিয়ান গভর্নমেন্ট নিল, আর একখানা (অস্ফুট) যেখানে বসে বসে ছাপা হয়, সেখানে সব বাঙালি— কাজেই— ''[৮৭]। অসম্পূর্ণ এই বাক্যটি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, 'বাঙালি' শব্দটি বিনয় খুব ভক্তিভরে, ভালোবেসে উচ্চারণ করেননি অনেক-অনেক বছর পরও। 'এন.বি.এ.' কর্তৃপক্ষ বিনয়ের সঙ্গে যে অসততা করেছিল, তেমনটা কিন্তু নয়। বরং ''...ওরা চটপট বইগুল ছাপতে লাগল।''[৮৮] অনুবাদক বিনয়ের পরিচিতি বাড়ল দ্রুত। একজন ইঞ্জিনিয়ার উপন্যাসের অনুবাদ করছেন, ব্যাপারটি তখন নাকি বেশ খানিকটা শোরগোলই তুলেছিলো তখন। চুক্তিপত্রটি সম্পর্কেও বিনয় আগাগোড়া ওয়াকিবহাল ছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, ভালোবেসে ক্রমান্বয়ে ব্যথা পেয়ে পেয়ে; অবহেলা, অমর্যাদা ও অন্যায়ের শিকার হতে হতে স্বজাতি 'বাঙালি'-র প্রতি তাঁর বিরূপ মানসিকতা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর জীবনকথার ধারাবাহিকতাতেই সেই ঘটনা-পরম্পরাগুলি আসবে।

বিনয় সবুসুদ্ধ উপরোক্ত ছ'টি বইই অনুবাদ করেছিলেন 'এন.বি.এ.'-র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে। তা ব্যতীত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তর্জমাকৃত একগুচ্ছ রুশ গল্প, কবিতা, চিঠি ইত্যাদিও সেই তালিকায় ছিলো। অনুবাদ করেছিলেন লের মন্তব, মিখাইল ব্লক, আন্না আখমাতোভা, এরেনবর্গো, পুশকিন, মায়াকভস্কি, ইয়েসিন প্রমুখের কবিতা। 'জনসেবক' পত্রিকায় আন্তন চেকভ-এর একাধিক গল্প (যার মধ্যে 'ডাক্তার' উল্লেখযোগ্য) ছাড়াও 'যুগান্তর', 'অমৃত', 'পরিচয়' ইত্যাদি কাগজেও বিনয়কৃত অনুবাদ সমানে চোখে পড়েছে। গোর্কির উদ্দেশে চেখভের লিখিত একটি চিঠি তিনি গিরিন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার জন্য অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও 'বক্তব্য' পত্রিকার সম্পাদক বিমান শিকদার, সুবন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখের অনুরোধে অগণিত রুশ কবিতার বঙ্গানুবাদ-কর্ম তাঁর সমধিক কৃতিত্বের ভিতরে পড়ে। কবি বিনয়ের পূর্বে অনুবাদক বিনয়ই যে কোলকাতার সাহিত্য-মানচিত্রে প্রথম পরিচয়ের দুয়োর ভেঙে জ্যোতির্ময় হয়ে এসেছিলেন, এতে অত্যুক্তি নেই। এহেন রুশজ্ঞ বিনয়কেই কিনা 'বাল্মীকি'-র কালে 'গোর্কি সদন' চত্বর থেকে অশ্লীলতার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছিলো বলে জনশ্রুতি! সে অন্য কথা।

রুশ ভাষা শিক্ষা তাঁর জন্য সাহিত্যিক সার্থকতা নিয়ে এলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির আবিল

ময়দানের কিমাকার ডাইনামোর 'পরে প্রস্তরযুগের ঘোড়া হয়ে মহীনের ঘোড়া তিনি কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ঘাসের লোভে চরতে চাননি। কমিউনিজ্‌ম তাঁর রক্তে প্রবাহিত হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু কমিউনিস্ট-প্রীতি বেশিদিন সহ্য হলো না তাঁর। ছ'মাস পরে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ ছেড়ে অনেকটা নাকখতের মতো করেই দোহাই দিলেন— "এত খাটতে হয়, এত দৌড়োদৌড়ি, ছুটোছুটি, যে আর আমার দ্বারা হল না, ছেড়ে দিলাম...রাত্তির সেই এগারোটা পর্যন্ত বক্তৃতা, বুঝতে পারছ?"[৮৯] বি.ই. কলেজের স্টুডেন্ট্‌স ইউনিয়নের নেতা, প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি বিনয় আর কলেজজীবন উত্তীর্ণ বিনয়ের মধ্যে তখন বিস্তর ব্যবধান। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সমরেশ বসু— এঁরা কেউই পার্টির মেম্বারশিপের বোঝা বয়ে বেড়াতে সক্ষম হননি বেশিদিন। স্বপ্নভঙ্গের কোন যন্ত্রণায় তাঁর তাবৎরকম রাজনৈতিক সংস্রবের পশ্চিমে শেষমেশ কবিতার সানুদেশে জানু পেতে বসলেন, সে সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য বিনয় যদিও দেননি; তবু কারণটা হয়তো অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। তা হলো, এ-কথাও তো ঠিক যে, মউ-চাষি আর আলু-চাষির ভূক্ষেত্র আলাদা! পার্টির রেজিমেন্টেশন, লৌহকঠিন অনুশাসনের অভ্যস্ততা ছেড়ে অত্যন্ত দ্রুত সরে এলেও তদানীন্তন বিপ্লবের বাণীবাহী রুশ ভাষাকে মৃত্যুর আগ অবধি ভুলতে পারেননি কবি। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে 'ISCAS' সংস্থার পক্ষ থেকে ঠাকুরনগর খেলার মাঠে বিনয় মজুমদারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছিলো। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সেই সময়কার সোভিয়েত রাশিয়ার কনস্যুলেট জেনারেল, কবি রবীন সুর প্রমুখ। বিনয় নাকি রুশ ভাষাতেই উপস্থিত অতিথির সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। একেবারে জীবনের উপান্তে এসে এই বিদেশি ভাষাটি লিখতে-পড়তে পারতেন না তিনি। কিন্তু অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। বিজন ঘরে শুয়ে নিজে-নিজে রুশ ভাষা আওড়াতেন।[৯০] এভাবে, মনেমননে এক একা কবি তাঁর 'অলটার ইগো'-র মুখোমুখি হতেন, জনান্তিকে। 'গৌতমের জন্যে লিখিত' নামের একটি নাটিকা[৯১]-র (এখনও পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অসংকলিত) দৃশ্যসমূহে বিনয়ের অন্তঃস্থ 'আমি' এইরকমই এক আসবাবহীন খোলা মঞ্চে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, অপর কোনও চরিত্র নাটিকাটিতে নেই। এদিকে, 'নিরীশ্বরবাদী' কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিনয়ের স্বর্গ, মর্ত্য, ঈশ্বরচিন্তায় দৃশ্যতই ফারাক ছিলো। বিনয় পাঁড় কমিউনিস্টদের মতো শুধুমাত্র মানুষের সংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, অন্যথায় সৃষ্টিকর্তার নিয়ন্ত্রণে বা কর্তৃত্বে প্রতিনিয়ত বিস্মিত হন। এই বিস্ময়বোধ ঐকান্তিকই কবির, কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শসম্ভূত নয়। এ-ইস্তক অগ্রন্থিত একটি কবিতায় বিনয়ের উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য —

"আমার যতটা মনে আছে

প্রশান্ত মহাসাগরে খুঁজে পেতে হয়েছে তো।

দ্বীপগুলি খুঁজে বার করেছিল

প্রধানত ইংরেজরা এবং সকল দ্বীপে মানুষ ছিল ও আছে, তবে

যে রকম আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে

প্রথমত মানুষ বা দেবদেবী পাওয়া গিয়েছিল

তারা ছিল উলঙ্গ ও আদিম দেবতা।

সব দ্বীপে এরকম দেবদেবী পাওয়া গিয়েছিল।

এশিয়ার মূল স্থান ডাঙা থেকে তারা কেউ যায় নি তো।

এর থেকে বোঝা যায় সৃষ্টিকর্তা আছেন তো

যিনি এই দেবদেবীদের দ্বীপপুঞ্জেই সৃষ্টি করেছেন।"[৯২]

এরপর থেকে যত দিন গেছে, সকল লোকের মাঝে বসে তাঁর নিজের মুদ্রাদোষে ক্রমশ পৃথক হয়ে যাওয়ার গল্প। বি.ই. কলেজের রাজনৈতিক আলোড়ন ফিকে ও অবান্তর হয়ে আসছে তাঁর কাছে। প্রেসিডেন্সি, কলেজ স্ট্রিট, কফিহাউস, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সরকারি-অসরকারি-দেশি-বিদেশি চাকরি ইত্যাদির মতোই তিনি আদর্শ-সংগ্রামকেও তিনি তোয়াক্কা করলেন না, অবলীলায় তা পার করে চলে এলেন। আসলে, বিনয়ের মনোজগতে তখন এক ধরনের ভাবগত ওঠাপড়া, তোলপাড়। সেই যে কাজী নজরুল দেশ স্বাধীনের নিমিত্ত সংগঠিত বিবিধ আন্দোলনের প্যারাডক্স দেখে ক্ষুণ্ণ উচ্চারণ করেছিলেন— "ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন!/ বেলা ব'য়ে যায়, খায়নি ক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন!"[৯৩] — অনেকটা সেইরকম হতাশা ও অসহায়তার কুয়াশা বিনয়কে আর পাঁচটা বোধিসম্পন্ন মানুষের মতোই ঘিরে ধরে। সংশয়, ব্যর্থতা, ক্লান্তি, টানাপোড়েন, অন্তঃসারশূন্যতা, একাকিত্ব প্রভৃতির লক্ষণাক্রান্ত বিশ শতকীয় মানসগঠন সম্বলিত বিনয় নিজের ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে হারতে থাকেন, যখন দেখতে পান— "...সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। প্রচুর উদ্বাস্তু এসে হাজির...কলকাতায় তাদের থাকতে দেওয়ার জায়গা হচ্ছে না। বাড়িঘর নেই, বেকার, চাকরি নেই, কী চাকরি দেবে? চাল-ডালের অভাব।...খাবার নেই। পুরো বীভৎস অবস্থা তখন। '৫৩ সালে অনেক হাতে-পায়ে ধরে নেহরু আমেরিকা থেকে গম আনায়। দেশ ভাগ হয়েছে '৪৭-এ। সারা বছর না খেয়ে, শুঁটকি মেরে, চাকরি নেই বাকরি নেই, থাকার জায়গা নেই, কিছু নেই— এ অবস্থায় থেকে ৬ বছর পর আমেরিকা দয়া করে গম পাঠাল। সেই গম খেয়ে খেয়ে মানুষের দিন চলে।"[৯৪] আবার, অন্য একটি আলাপগল্পের মধ্যে থেকেও তাঁর সমান নৈরাশ্য ফুটে

ওঠে— "...আসলে কি, পঞ্চাশের দশক একটা অদ্ভুত সময়— স্বাধীনতার ঠিক পরেই— প্রাণে আমাদের স্বপ্ন, এতদিনের দারিদ্র, গ্লানি বোধহয় এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে— কিন্তু কী হল তা তো দেখতেই পাচ্ছ— অবস্থার আরো অবনতি।..."[৯৫] শেষে, আর্ত হৃদয়ের চিলের কান্না থেকে বিকর্ষিত বিনয়, হারা-লড়াইয়ের স্মারক-কুঠার অবনমনের বেনোজলে ছুঁড়ে ফেলে লেখনী ধারণের আপাত নান্দনিকতায় টাট্‌কা বাতাস নিতে আসেন।...

সেই মোহভঙ্গের পর জীবনে আর কখনওই রাজনীতির সংক্রমে তিনি জড়াননি, রাজনৈতিক কথাবার্তায় অংশ নিতে দেখাননি বিন্দুমাত্র উৎসাহ। উল্টে সকুণ্ঠ ভঙ্গিমায় খাপছাড়াভাবে বলছেন— "না আরে শোনো না, আমি না, এস.এফ.আইয়ের মেম্বার। আমি হতে চাইনি, স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মেম্বার আমি..."[৯৬] এই প্রসঙ্গে অধিক বাক্যব্যয়ে তাঁর অনীহা বা অমনোযোগ বেশ টের পাওয়া যায় একটি তথ্যবিচ্যুতি দেখে। বিনয়ের ছাত্রাবস্থায় 'এস.এফ.আই.'-এর জন্ম হয়নি কিন্তু। অবধারিতভাবেই তা 'এ.আই.এস.এফ.' হবে। বিনয় মজুমদারও তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রত্ব ফুরলে পথ-আন্দোলনের প্রতি আর কোনওরূপ স্পৃহা বোধ করছেন না। কবিতাই তাঁর আলম্বন, সবিতাব্রত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খাদ্য আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ভাষা-শহিদ আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, নকশালবাদী আন্দোলন— পরের পর রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের ঘূর্ণিস্রোত তাঁর পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিচ্ছে, তা সত্ত্বেও কবিতাপ্রাণ তাঁর চোখের পাতা ভিজে উঠলো না। সে-কারণেই তাঁর উত্তরণসম্ভব কাব্যপ্রতিভাও স্থবির হয়ে রইলো। তার পরিবর্তে বিনয় লিখে চললেন অক্ষরবৃত্তীয় গড়নে আদতেই জীবনবৃত্তীয় উবাচ। নির্মোহ বিনয় বলেছিলেন— "আমি লিখেছি আমাকে নিয়ে, আমি অন্য কাউকে নিয়ে কবিতা লিখিনি। সবই আমার দিনপঞ্জি।...

"...আসলে পঞ্চাশের কবিরা প্রায় সবাই আত্মজীবনীমূলক কবিতা লিখেছে। শুধুমাত্র নিজেদের নিয়ে লেখা। এটা একটা ট্রেন্ড বলা যেতে পারে। কেননা, এর আগে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ লিখেছেন, নজরুল লিখেছেন। পঞ্চাশের পরেও বিভিন্ন কবিরা লিখেছেন। কিন্তু, পঞ্চাশের প্রায় সবাই নিজেদের নিয়ে লিখেছে।"[৯৭] বিংশ শতাব্দীতে এসে যে কোনও মনুষ্যধর্মেই এই দশকভেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ চেহারা নিয়েছিলো। কারণ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বিষয়ে নব্যতর অবাকস্তম্ভ স্থাপনা অধিক অধিকতর ক্ষুদ্র সময়ের এককে তখন জিন পরায়। 'আগামী কাল' সূর্য উঠলেই যে 'আজ' বড় পুরনো হয়ে পড়ছে— এ উদ্ভাবনা বিশ-এর। লক্ষনীয়ভাবে, গেল-শতকের প্রতিটি দশক বাংলা আধুনিক কবিতার মানচিত্রে নিয়ে এসেছে নতুন রাস্তার গান। কবি সুব্রত রায়চৌধুরী উল্লেখযোগ্য পরপর তিনটি দশকের পার্থক্য খুব সুন্দরভাবে নির্ধারণ করেছিলেন— "ত্রিশের কবিরা মিলিত হয়েছিলেন রবীন্দ্র প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য, সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাস ৪০-এর

অধিকাংশ কবিদের একত্রিত করেছিল, স্রেফ বন্ধুত্বের টানে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন ৫০-এর কবিরা।...''[৯৮] কিন্তু এই সরলীকরণে চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যকার মানসিক দূরত্বটি সম্যক অনুধাবন করা যাবে না। সেখানে আসার আগে এই দুই দশকের কবিনামগুলি একটু জেনে নেওয়ার প্রয়োজন। চল্লিশের দশকের স্মরণযোগ্যতা দাবি করা নাম অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাস, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, নরেশ গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, মণীন্দ্র রায়, কবিতা সিংহ, অরুণকুমার সরকার, লোকনাথ ভট্টাচার্য, তরুণ সান্যাল প্রমুখ। আর পঞ্চাশের দশকের খ্যাতিমান কবিরা হলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, উৎপল কুমার বসু, পূর্ণেন্দু পত্রী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। এখন, চল্লিশের কবিরা বিপ্লবের হাতিয়ার নিয়ে জনারণ্যে নেমে এসেছেন, প্রেমের হাত নিয়ে পঞ্চাশের কবিরা গিয়েছেন জনান্তিকে। কিন্তু, মাত্র দশ বছরের ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে এত পরিবর্তন যখন আসে, কারণের গভীরতা ও গভীরতার তাৎপর্যের সূক্ষ্ম হিসেব তখন বুঝে নিতে হয়। মূলত, 'স্বাধীনতা' শব্দটির আনীত সাময়িক মুক্তি ও একইসঙ্গে চিরন্তন বিযুক্তিই এ-দুই দশকের কবিমহলের চিত্তগত যোজনদূরের রচয়িতা। চল্লিশ ও পঞ্চাশ উভয় দশকের কবিরাই সংকটের দলিল লিখেছেন। তবুও কবিতাকার হিসেবে কেন তাঁরা পরস্পর ভিন্‌লোকের বাসিন্দে, এভাবে বললে তা বোধহয় সহজে বোঝা যাবে— ধরা যাক, একটা সহস্র সিঁড়ির বন্ধ দুয়োরের মন্দির। সেই সোপানশ্রেণির শেষ কয়েকটি ধাপ জুড়ে দৃপ্ত কিছু ক্লান্তিহীন পা। দ্বারোদ্‌ঘাটনের উত্তেজনায় চল্লিশের সৈনিকেরা ফুটছেন; হৃদয় ফুটছে, পাল্লা দিয়ে রক্তগরম আখর ফুটছে। এরপর, এই অদ্ভুত আনন্দের পর, উন্মোচিত মন্দিরগৃহটি দেখা গেলো বিগ্রহশূন্য। রাতারাতি চল্লিশের রাজনৈতিক সংকট পঞ্চাশের মানস-সংকটে রূপ নিলো। অর্থাৎ, সামনেই 'স্বাধীনতা' নামক মহাসত্য, তার মন্ত্রপূত উত্তাল পর্বে তখন চল্লিশের কবিরা কেউ তরতাজা যুবক, কেউ-কেউ বল্গাহীন কিশোর। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ বুকে জনজোয়ারে নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়েছেন তাঁরা। আর পঞ্চাশের কবিরা তখন সবেমাত্র কিশোর, দেখে ফেললেন স্বাধীনতার 'মহাসত্য' কী করে এক নির্বিকার 'মহাশূন্য'-এ পরিণত হয়। দিক্‌চিহ্নহীন অবিশ্বাস, সংশয় ও সন্দেহের বিষতির গায়ে তাঁরা প্রেম, অতিপ্রেম, অন্ধযৌনতা-র গহ্বরে ঝাঁপালেন বা বলা ভালো, ঝাঁপাতে বাধ্য হলেন। অঙ্গভঙ্গ ও মনোহানির কারণকিসিমের কূটনৈতিক এষণার চাইতে সেই মুহূর্তে জৈব শুশ্রূষার উষ্ণতা সঙ্গত কারণেই তাঁদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছিলো। প্রেম, তাঁদের কাছে 'নিঃশব্দচরণে' বা 'মহা সমারোহে'— কোনওভাবেই আসেনি; বলা যায়, 'Love' was then ointment rather than settlement to them. চল্লিশের কবিরা যদি 'সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী' হয়ে থাকেন, পঞ্চাশের কবিরা সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই

‘সাংসারিক সন্ন্যাসী’— মউ-পিয়াস ও বন্ধনমুক্তির প্রয়াস যুগ্মতই জাতধর্ম তাঁদের, ভাঙনের পথ ধরে শুদ্ধ রাতে তাঁদের আসা, যাওয়া, জলসোহাগ, বাসা বাঁধা, উড়ালফের...। তাহলে রাজনীতিত্যাগ ও পঞ্চাশের কবির নিয়তি বিনয়ের জন্য বরাদ্দই ছিলো। যাক সে কথা।

অমলকুমার মণ্ডল মহাশয় জানাচ্ছেন— “...ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া তিনি নানাবিধ অন্য কাজে জড়িয়ে পড়তেন। এরপরেও দেখা যায়, ১৯৫৭ সালে তিনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হন। রেকর্ড নাম্বার নিয়ে পাস করেন। শোনা যায়, বিনয়ের পাওয়া নম্বর আজও কেউ নাকি ভাঙতে পারেননি।”[৯৯] এদিকে একটি সাক্ষাৎকারে, তার শোনাকথা বিনয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলে প্রশ্নকর্তাকে বিনয় উত্তর করেছিলেন— “সত্যি কথা”।[১০০] শিবপুর বি. ই. কলেজের নথিপত্র ঘেঁটে হয়তো এর সঠিক সত্যতা উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু তা অবান্তর। বিনয়কথায় বিনয়ের বাধ্যগত পড়াশোনা ও তার সাপেক্ষ পরীক্ষার ফলাফল খুব জরুরি নয়। কেননা, কবির কোনও ডিগ্রি হয়না! শুধু জন্মগত ধীসম্পন্ন বিনয় তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রাবস্থায় কিছু না কিছু স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, এটাই শেষ সত্যি।

শিবপুরের আবাসিকজীবন ফুরনোর পর ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছেই বিনয়ময় ছিলো। আর কিছুদিন পর কবিতায় যে তাঁর দিনরাত্রি কাটবে, একথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি তখনও। এক বছরের মধ্যেই চাকরি নিলেন ‘অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ’-এ; অধ্যাপনার কাজ, সময়টা ১৯৫৮। প্রথম সামাজিক সফলতাটি নিয়ে বিনয় একটি সম্মুখ-আলাপে বলছেন— “প্রথম চাকরি— বেশ আরামেরই ছিল সেটা...মাইনেটা মন্দ ছিল না— কাজকর্ম প্রায় কিছু ছিল না বললেই চলে।”[১০১] কিন্তু প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা ক্রমেই অসহিষ্ণুতার জায়গায় পৌঁছে যেতে শুরু করেছিলো বিনয়ের ক্ষেত্রে। প্রথম চাকরিটি ছেড়েও দিলেন অনতিবিলম্বে। তারপর ‘ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট’-এ তিনি ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চাকরি ছেড়ে এবার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরাগমন। অতঃপর ত্রিপুরা ছেড়ে অ্যাডিশনাল কন্ট্রোলিং ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট। এটাই তাঁর জীবনের শেষ বন্ধন। এখানে তাঁর অন্যমনস্কতার জন্য কোক ওভেনে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো বলে লোকপ্রচার থাকলেও বিনয় সর্বান্তঃকরণে এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, “না এমন কোন ঘটনা ঘটেনি।”[১০২] ততদিনে কবিতাপ্রীতি তাঁকে অনেকাংশে ভূতগ্রস্ত কবি বানিয়ে ফেলেছে, কবিতায় তিনি ঘর বাঁধছেন, আরাধ্য ঈশ্বর বলে মানছেন কবিতাকে, চাকরির জন্য ডিভোশন পলে-পলে কবিতার প্রতি ইমোশনের ক্ষতি করছে বলে অনুভব করছেন। বিনয়ের এই মেজাজটির সঙ্গে মার্কিনদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিট্ কবি, বিট্ আন্দোলনের প্রতিভূ,

অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ-এর বিটনিক মানসলোকের আশ্চর্য মিল। বিনয়ের পঞ্চাশের সহযোদ্ধা সুনীল তাঁর বিদেশিবন্ধুটি ও তাঁর সাহিত্যবোধের সঙ্গে আমবাঙালিকে এভাবেই পরিচিত করিয়েছেন— "অ্যালেনের তত্ত্ব ছিল এই যে, শিল্প-সাধনা একটা চব্বিশ ঘণ্টার কাজ, লেখক-শিল্পীদের কোনো চাকরি-বাকরি করা উচিত নয়। সরকার কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকেও তারা কোনোরকম সাহায্য গ্রহণ করবে না। নিজেদের সাহিত্য-শিল্প সামগ্রীর বিনিময়ে পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের কাছে থেকে যা পাবে, তা দিয়েই গ্রাসাচ্ছাদন করতে হবে। সেজন্যই জীবনযাত্রার মানও হবে অতি সরল, পেট ভরাতে হবে অতি সাধারণ খাবারে, যে-কোনোরকম পোশাকে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। এমনকি দাড়ি কামাবার পয়সাও বাঁচানো যেতে পারে। আমেরিকার সমাজে সেই প্রথম ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরা শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আবির্ভাব। অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ যথেষ্ট শিক্ষিত, সে একসময় 'নিউজ উইক' পত্রিকায় চাকরি করেছে, ইচ্ছে করলেই সে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে, সাজানো অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, উচ্চ মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করতে পারতো, কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এরকম ত্যাগের জীবন বেছে নিয়েছিল।"[১০৩] অবশ্য পরে বহুবার সহজিয়া সফলতা পরিহারের সিদ্ধান্তের হঠকারিকার জন্য খেদোক্তিও করতে হয়েছে বিনয়কে। 'চাকরি ছাড়লেন কেন' প্রশ্নটির উত্তরে তাঁর উত্তর ছিলো— "দলে পড়ে। তখন কবি শক্তিও চাকরি করে না— বেকার— বই লিখছে। শরৎ মুখোপাধ্যায় বেকার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, দলশুদ্ধ বেকার, বই লিখছে সঙ্গে পড়ে।...চাকরি করতে করতে কবিতা লেখা দুর্গাপুরে কঠিন কাজ। সাহিত্যচর্চা করতে করতে— হয়তো সম্ভব। এরপরে আর চাকরি করিনি।"[১০৪] কিন্তু যে দলটির কথা বিনয় লিখছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই কবিতার সঙ্গে গেরস্তালি করে নয়-নয় করে আয়ুষ্কাল পার করে গেলেন বা যাচ্ছেন এখনও; সেখানে কবিতার ক্রীতদাস বিনয় একাই চড়কের গাছে উঠে রাস্তা হারালেন! স্বপ্নের মই কে বা কারা তাঁর অজানিতেই সরিয়ে নিয়ে গেলো। সুনীলের কথায়— "আমাদের সমবয়সীদের মধ্যে বিনয়ই কবিতার জন্য বেশি ঝুঁকি নিয়েছে। আমাদের অনেক পিছুটান ছিল, বাড়ির কথা চিন্তা করতে হয়েছে, জীবিকার জন্য খোঁজা খুঁজি ছিল, ব্যক্তিগত কিছু কিছু শখ মেটাবারও ব্যাপার ছিল, কিন্তু বিনয় ঝাঁপ দিয়েছে সব কিছু ভুলে। ভালো ছাত্র ছিল বিনয়, তার জন্য জীবিকার পথ প্রশস্ত ছিল, কিন্তু সে কিছু তোয়াক্কাই করেনি।"[১০৫] অথচ যে সুনীল সময় বা পাঠিকা কিংবা সুহৃদের হৃদয়কে বিদ্ধ করেছিলেন "শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার/ জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা/ ভুবন পেরিয়ে আসা,.../ শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী,.../ শুধু কবিতার জন্য আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়/ মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা , শুধু কবিতার/ জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।"[১০৬] উচ্চারণে, তিনি ও তাঁরা কিন্তু তোয়াক্কা করলেন। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শৌখিন শীতল ছত্রছায়ায় ক্যাফে, কফি ও কবিতায় মাতলেন তাঁরা, আর নির্বাসিত বিনয়কে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হলো

"আনন্দ পাবলিশার্সের উচিত ছিল আমার একটা বই বের করা"[১০৭] বলে। একথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, শহরের কোনও প্রথম সারির প্রকাশনাই বিনয়মুদ্রণে কখনও উৎসাহিত হয়নি।...

স্বল্পমেয়াদী চাকরিজীবন শেষ হলে বিনয়ের জীবনের চাকা অন্য খাতে গড়াবে এবং কোনও গড়িয়ে যাওয়া চাকা-কে ফিরে আসার আর্তি জানিয়ে অক্লান্ত নাছোড় বিনয়, দিব্যোন্মাদ বিনয় তিলে তিলে মরবেন। কিন্তু, বিনয়ের কাব্যজীবন ও স্বেচ্ছা-নির্বাসনের দুনিয়ায় স্থায়ী চোখ রাখার আগে, তাঁর কোলকাতায় আগমনের পর ভূবিশ্বের পাঠক্রম কীভাবে তার খোলনলচে বদলে ফেলছিলো, আমরা দেখে নেবো। প্যালেস্তাইন থেকে বিচ্যুত একটি ভূখণ্ডের ইহুদি-রাষ্ট্র ইজরায়েল নামে জন্ম ও পরিচিতি লাভ (১৯৪৮ খ্রিঃ), ভারতে গান্ধি-হত্যা (১৯৪৮ খ্রিঃ), পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট-উত্থান (১৯৪৮ খ্রিঃ), মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯ খ্রিঃ), মতাদর্শের সংঘাত, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পৃথক দু'টি রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির আত্মপ্রকাশ (১৯৪৯ খ্রিঃ), সোভিয়েত রিপাবলিকের অন্তর্গত কাজাখাস্থানের প্রত্যন্তে সোভিয়েত নেতাদের পরমাণুবোমা পরীক্ষা ও সাফল্য, রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা (১৯৪৯ খ্রিঃ), পৃথিবীর রাজনৈতিক ভরকেন্দ্রের দখলদারি নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে শীতলযুদ্ধের অবতারণা, মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো-র প্রতিপক্ষে রাশিয়ার 'ওয়ারশ প্যাক্ট' প্রতিষ্ঠা (১৯৫০ খ্রিঃ), কমিউনিস্ট চিনের তিব্বত আক্রমণ (১৯৫০ খ্রিঃ), দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যনীতিতে সরকারি সিলমোহর (১৯৫০ খ্রিঃ), উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ায় অন্তর্বর্তী যুদ্ধ শুরু (১৯৫০ খ্রিঃ), ইন্দোচীনের পূর্বাংশে ভিয়েতনাম রাষ্ট্রে বিভাজন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে হো চি মিনের কমিউনিস্ট শাসনাধীনে উত্তর ভিয়েতনাম এবং মার্কিনপন্থী দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্ম (১৯৫০ খ্রিঃ), হাঙ্গেরি-তে কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গির্জার স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ধর্মতত্ত্ব বিভাগ' (Theology Department) বন্ধের নির্দেশ, গির্জার প্রধান যাজক-কে গ্রেফতার ও গির্জা অবরোধ (১৯৫০ খ্রিঃ), নেভাদা মরুভূমিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু পরীক্ষা (১৯৫১ খ্রিঃ), রণোন্মত্ত চিনের সামনে তিব্বতপ্রধান দার্শনিক দলাই লামা-র পশ্চাদ্‌সরণ (১৯৫১ খ্রিঃ), জর্ডনের রাজা আবদুল্লা-হত্যা (১৯৫১ খ্রিঃ) , আমেরিকায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ-চুল্লি স্থাপন (১৯৫১ খ্রিঃ), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা (১৯৫২ খ্রিঃ), ডেনমার্কে লিঙ্গ-পরিবর্তনের প্রথম অস্ত্রোপচারে সাফল্য অর্থাৎ ঈশ্বর নস্যাতে স্পর্ধী মানুষের অপ্রতিরোধ্য রথচক্র (১৯৫২ খ্রিঃ), অ্যানা ফ্রাঙ্ক-এর ডায়েরি প্রকাশ (১৯৫২ খ্রিঃ) , গুপ্তদল 'মাউ মাউ' কর্তৃক কিকিয়ু উপজাতির সংঘবন্ধন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯৫২ খ্রিঃ), বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা ঘোষণার দাবিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা

বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র আন্দোলন, পাক-পুলিশের অন্ধ গুলিচালনা, হত্যালীলা (১৯৫২ খ্রিঃ), পৃথিবীর প্রথম হিসেবে নিউ জিল্যান্ড-নিবাসী এডমন্ড হিলারি ও শেরপা তেনজিং নোরগে-র একত্রে মাউন্ট এভারেস্ট বিজয় (১৯৫৩ খ্রিঃ) জোসেফ স্ট্যালিন-এর মৃত্যু (১৯৫৩ খ্রিঃ), পূর্ব জার্মানিতে জার্মান শ্রমিকদের সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলন (১৯৫৩ খ্রিঃ), জীববিদ্যায় তড়িচ্চমক, মার্কিনদেশে 'ডি.এন.এ'.-র গঠন আবিষ্কার (১৯৫৩ খ্রিঃ), ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৩ খ্রিঃ), উন্নততর মার্কিন নৌবাহিনী গঠনের উদ্দেশে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন ডুবোজাহাজ নির্মাণ (১৯৫৪ খ্রিঃ), ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া)-এ হৃত ক্ষমতাদারি পুনরর্জনে ফ্রান্সের প্রাণপাত ও লড়াইয়ে ভিয়েত মিন ন্যাশানালিস্ট ফোর্স-এর হাতে ফরাসি সেনার ভরাডুবি (১৯৫৪ খ্রিঃ), 'ওয়ারশ প্যাক্ট'–এ আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষরনামা (১৯৫৫ খ্রিঃ), বিশ্ব-রাজনীতিতে বিপর্যস্ত ফ্রান্সের হাতে থাকা সিংহভাগ উপনিবেশগুলির মুক্তি; সুদান, মরক্কো ও তিউনিশিয়ার স্বাধীনতা; আলজিরিয়ায় স্বাধীনতার সংগ্রাম (১৯৫৬ খ্রিঃ), এলভিস প্রেস্‌লি-র গান নিয়ে ভয়াবহ উন্মাদনা, প্রেস্‌লির জনপ্রিয়তার প্রশ্নে তরুণ ও বয়সী প্রজন্মে আমেরিকার দ্বিধাবিভক্তি (১৯৫৬ খ্রিঃ), প্রভাবশালী বিট্ কবি অ্যালেন গীন্‌স্‌বার্গ-এর উদ্দীপক ও চর্চিত কাব্যগ্রন্থ 'হাউল অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' প্রকাশ (১৯৫৬ খ্রিঃ), মহাকাশে সোভিয়েত দেশের মহাকাশযান 'স্পুৎনিক ১' প্রেরণ (১৯৫৭ খ্রিঃ), বিখ্যাত মার্কিন কোম্পানি 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন' সংক্ষেপে 'আই. বি. এম.' কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গয়েজ' তৈরি (১৯৫৭ খ্রিঃ), পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছ'বছর পড়ে থাকার পর বিট্ প্রজন্মের 'বাইবেল' মার্কিন লেখক জ্যাক কেরুয়্যাক-এর সাড়া-জাগানো ও মাত্র তিন সপ্তাহে লিখিত উপন্যাস 'অন দ্য রোড' প্রকাশ (১৯৫৭ খ্রিঃ), 'ডাঃ জিভাগো' উপন্যাসের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিতর্কিত লেখক বরিস পাস্তেরনাক-এর নোবেল পুরস্কার লাভ ও রাষ্ট্ররোষগ্রস্ত পাস্তেরনাক কর্তৃক পুরস্কার প্রত্যাখ্যান (১৯৫৮ খ্রিঃ), দু'বছরব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের অবসান, একনায়ক বাতিস্তা-র পরাজয় ও ফিদেল কাস্ত্রো কর্তৃক কিউবায় নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা (১৯৫৯ খ্রিঃ), ৪৯তম ও ৫০তম প্রদেশরূপে 'আলাস্কা' ও 'হাওয়াই'-এর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি (১৯৫৯ খ্রিঃ), ভৃত্যের ছদ্মবেশে দলাই লামা-র জন্মভূমি তিব্বতত্যাগ ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু-র সঙ্গে সাক্ষাৎ (১৯৫৯ খ্রিঃ), ব্রিটিশের অধীনতা থেকে ইউগান্ডা, জাম্বিয়া ও কেনিয়ার মুক্তি এবং ফরাসি হাত থেকে মাউরিটানিয়া, মালি, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট, আপার ভোল্টা, নিগার, চাদ, টোগো, ক্যামেরুন, গাবন ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ (১৯৬০ খ্রিঃ), ২৮ মাইল (৪৫ কি.মি.) লম্বা ও ১.৫ মিটার (৫ ফুট) উঁচু কুখ্যাত 'বার্লিন ওয়াল'-এর নির্মাণযজ্ঞ শুরু (১৯৬১ খ্রিঃ), আফ্রিকার কঙ্গো-য় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত (১৯৬১ খ্রিঃ), প্রথম মানুষ হিসেবে

রুশদেশীয় ইউরি গ্যাগারিন-এর মহাকাশযাত্রা (১৯৬১ খ্রিঃ), ভারতের অসম রাজ্যের বরাক উপত্যকার শিলচরে সরকারিভাবে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আন্দোলন, পুলিশের অবিবেচক গুলিবর্ষণ, নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের হত্যা (১৯৬১ খ্রিঃ), এক শতাব্দী ফরাসি অধীনতার অন্তে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আলজিরিয়ার আত্মপ্রকাশ (১৯৬২ খ্রিঃ)[১০৮]— মোটামুটিভাবে এই। এই যে যুদ্ধ, যুদ্ধতর ও যুদ্ধতম পরিস্থিতির হাল্লাবোল বিশেষত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিক পেশল উল্লাসের চরিতার্থতায় মানুষের নিয়তিতে লট্‌কে দেওয়া ও তাকে ভবিষ্য-প্রকরণ বা প্রবণতাজ্ঞানে আসনীকরণ একেবারেই বিশ শতকের দান। আর মানবিক সমাজসভ্যতার অবনমন ও অপনয়নেই যেন বেশি করে প্রযুক্ত হতে চলা বিজ্ঞানক্ষেত্রীয় উদ্ভাবনের হাই-ভোল্টেজ স্পার্কগুলি মানুষের যাবতীয় স্বাভাবিক স্বাধিকার, উত্তরাধিকার, বোধ ও চেতনা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। অতএব পঞ্চাশের দশকের যে স্মিত তেজস্ক্রিয়া কবিরা প্রথম যৌবনে সইলেন, তাতে তাঁদের সামনে দু'টি মাত্র ভিন্নমেরুর কিন্তু অভিন্ন পরিণতির মার্গই অধিগ্রহণের জন্য ছিলো। এক, নিরন্তর জ্বলায়, উদভ্রান্ত ভোগে ও নির্বিকার ত্যাগে আত্মহনন এবং দুই, নির্মোহ অন্তরালবাস ও আত্মখনন। আমাদের আলোচ্য কবি বিনয় এই দ্বিতীয়টির পথিক।...

পঞ্চাশের দশকের পর থেকে কাউন্টার কালচার বা বিপ্রতীপ সংস্কৃতির যে ধারার উত্থান আমেরিকায় হয়, সেই সুরটি সদ্য স্বাধীন দেশটির বরাবরের সাংস্কৃতিক রাজধানী কোলকাতা শহরকে ছুঁয়ে যাবে, কোলকাতা শহরেও বয়ে যাবে কিছুদিন পর। মুখ্যত ষাটের দশকের বাংলার 'হাংরি জেনারেশন'-এর উপরই গীন্‌স্‌বার্গের বিট্ মানসিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিলো। তার আগের অবশ্য উদ্ধারযোগ্য ঘটনা ইংরেজি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা ১৩৬০ সনের শ্রাবণ মাসে তখন তরুণ দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায়, বলা ভালো উদ্দীপনায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ, 'কল্লোল'-এর পর আর যে পত্রিকাটি চলে আসা তাবৎ বাংলা সাহিত্যের আদর্শবৃক্ষকে পর্ণমোচী করে ছাড়ে। সুনীল বলছেন— "জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর এক বৎসর আগে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। যে-কোনো পত্রিকার নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি হতে দু-তিন বছর সময় লাগে। সেই অবসরে গড়ে ওঠে নিজস্ব এক গোষ্ঠী। এই কৃত্তিবাসের দলবলই যে গলা ফাটিয়ে রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান কবি হিসেবে জীবনানন্দকে সিংহাসনে বসায়, এরকম দাবি করলে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না, বরং ইতিহাসকেই মান্য করা হবে। যেহেতু কৃত্তিবাস পত্রিকার পৃষ্ঠায় বামপন্থী বা রাজনীতি নিরপেক্ষ (দক্ষিণপন্থী কবি বলে কিছু হয় না) সব কবিরই স্থান পেতে কোনো বাধা ছিল না, তাই কৃত্তিবাসের দলবল বলতে সাধারণভাবে 'আধুনিক' তরুণ কবির দলকেই বোঝায়। জীবনানন্দ প্রিয় কবি হতে পারেন, কিন্তু তিনি অনুকরণযোগ্য নন। এই

ধরনের দু-একজন কবি বা কথাসাহিত্যিক কদাচিৎ কোনো সাহিত্যে আবির্ভূত হন, যাঁরা আউটস্ট্যান্ডিং, তাঁরা নিঃসঙ্গ। তাঁরা বিষকন্যার মতন, ভাষার দিক থেকে তাঁদের আলিঙ্গন করতে গেলেই নির্ঘাৎ মৃত্যু।...”[১০৯]

এই ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সঙ্গে বিনয় জড়িত হচ্ছেন আরও দশ-এগারো বছর পরে ১৯৬৩-’৬৪-তে। বিনয়ের কথায়— “...১৯৬৩ সালের নভেম্বর কি ডিসেম্বরে আমি ফিরে গেলাম কলকাতায়। শক্তি একদিন একখানি চটি পত্রিকা টেবিলে রেখে বললো, ‘এই হলো কৃত্তিবাস। তোর কবিতা দে, কৃত্তিবাসে ছাপবো।’ তার আগে ‘কৃত্তিবাস’ আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি, নাম শুনেছিলাম অবশ্য। আমি বললাম, ‘আমি তো কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি। ফলে দেবার উপায় নেই।’ উত্তরে শক্তি বললো, তুই না-লিখলে ‘কৃত্তিবাস’ বারই করবো না আর, বন্ধ ক’রে দেবো। তুই তাড়াতাড়ি কবিতা লিখে দে।’ চাপে প’ড়ে আমি রাজি হলাম লিখতে। এইভাবে ১৯৬৪ সালে কৃত্তিবাস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি।”[১১০] অবশ্য বিনয়কে ‘কৃত্তিবাসী লেখক’ ঠিক বলা চলে না। কেননা, কৃত্তিবাস ঘরানার লেখকদের লিখনের পাশাপাশি জীবনের একটি দামাল, অ-সামাল যাপনকথা সবসময়ের জন্য ছিলো। সুনীল যে সময়ের কথা এভাবে বলেন— “আমার তখন অল্প বয়েস, বেশ গড়া-পেটা শরীর স্বাস্থ্য, ঝুঁকিবহুল জীবন কাটাতে ভালোবাসি। হঠাৎ হঠাৎ বন্ধুদের সঙ্গে বনে-পাহাড়ে চলে যাই, কিংবা সিমলা-হায়দ্রাবাদের মতন বড় শহর দর্শন করতে গিয়ে পয়সার অভাবে এক-আধদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিই। কিংবা মধ্যরাত্রে কলকাতা শহরে অকারণে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মারামারি বাঁধিয়ে পুলিশের গুঁতো খাই, গারদে চোর-পকেটমারদের সঙ্গে রাত কাটাই। তবু কিছুই গায়ে লাগে না, সবই যেন মজা। স্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের মধ্যে জীবনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখার চেষ্টা...”[১১১] ; বিনয় তখন নাগরিক কবিয়াল হয়ে থাকার পরিবর্তে আত্মনির্বাসনের প্রস্তুতিপর্ব ধীরে ধীরে সাঙ্গ করছেন। সে-প্রসঙ্গ ঠিক সময়ে আসবে। আপাতত, কিছুটা পিছনে হেঁটে বিনয়ের কলেজজীবনের সমাপ্তি ও পেশাদার কবিজীবনের সূচনার মধ্যবর্তী সময়টিতে আলো ফেলা যাক।

প্রতিষ্ঠাযোগ্য চাকরিগুলির কথা বাদ দিলে, দু’একবার কিছু খুচরো কাজ বিনয়কে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য করতে হয়েছিলো। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন গার্ডেনরিচ ব্লকের একটি কারখানায় তাঁর প্রথম চাকরির কথা।[১১২] শিয়ালদার নিকটস্থ ভবানীপুর টিউটোরিয়ালে পড়িয়েও অর্থ উপার্জন করেছেন একসময়।[১১৩] শক্তি চট্টোপাধ্যায় সেখানে বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়াতেন, ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় পড়াতেন বাংলা, বিনয় মজুমদার গণিত। বিনয় মাস দু’য়েকের মতো ‘হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় সহ-সম্পাদকের কাজও করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ঘিরে থাকা সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক খাঁচার ভিতরেই যে

অচিন পাখির মনকেমন আসা-যাওয়া।...

১৯৫৮-য় 'অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ'-এ চাকরির দিনগুলি তাঁর কবিজীবনের সলতে পাকানোর পর্ব হিসেবে খানিক সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিলো। ১১০, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে ছিলো সেই অফিস। সেই সময় অনুবাদক বিনয়ের একটি পরিচয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ্যে এসেছে ('অতীতের পৃথিবী', এন.বি.এ., জানুয়ারি, '৫৮), পরিচিতিও বাড়ছে, হাতে বেশ কিছু নগদ অনুবাদের কাজ। তখন অফিস-ফেরত বিনয় প্রায়ই আড্ডা মারতে চলে আসছেন কলেজ স্ট্রিটের সুবিখ্যাত কফিহাউসে। সেই রুশ ভাষা শেখার দিনগুলির পরে পুনরায় কোলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে তাঁর। বিনয় লিখছেন— "কলকাতায় তখন নিজেকে একেবারে নবাগত ব'লে মনে হতে লাগলো। কফির আসরে, আড্ডাখানাগুলিতে আমি যেতাম আমার অফিস ছুটি হলে পর। দেখতাম আলোচনার বিষয় সর্বত্রই সাহিত্য এবং রাজনীতি। অথচ বাংলা সাহিত্যের খবর আমি তখন তেমন রাখতাম না। রাখার সুযোগই হয়নি ইতিপূর্বে। ফলে আলোচনায় যোগদান করা আমার হতো না। চুপচাপ ব'সে শুনতাম কে কী বলে। তারপর ভাবলাম আর কিছু না হোক লোকজনের সঙ্গে মেশার জন্যই তখনকার আধুনিক কাব্য সাহিত্য কিছু পড়া ভালো। কোথায় কে কী লিখছে তার একটু খোঁজ রাখা ভালো। ফলে কিছু পড়াশুনা শুরু করলাম।..."[১১৪] এদিকে, '৫৯ পর্যন্ত কবিতার নিজস্ব ফর্ম, স্টাইলাইজেশন তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না, খুঁজছেন।[১১৫] কিন্তু, কফি হাউসের কাব্যদেশে এসে বিনয় কবি, কবিতা ও কবিযশ নিয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ছেন তীব্রভাবে।

'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব' থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৫৭-'৫৮ সাল নাগাদ কুশল মিত্র নামের এক কবির সঙ্গে তাঁর আলাপ হওয়ার কথা। এই কুশল মিত্রের সূত্রেই আজ-লুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত দেবকুমার বসু-র সঙ্গে বিনয়ের পরিচয় হয়। কালে কালে তা আরও গাঢ় হবে। একটি একক ও মৌলিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছেখুশি কবিমনে দানা বাঁধছে। কফি হাউসের আড্ডায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় তখন কবিরূপে স্বল্প-খ্যাত। ওদিকে বিনয়ের কাছে তখন অবধি প্রকাশকেরা অনুবাদের অনুরোধেই সামিল। 'দিগ্‌দর্শন' নামক পত্রিকার পাতায় তাঁর করা কিছু গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এই সময়েই। অনুবাদকর্মের ক্লান্তিতে বিরক্তি বাড়ছে বিনয়ের। উপযাজক হয়ে কোনও পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর তাগিদ অনুভবও করছেন না তেমন। এমতাবস্থায়, বিনয় বলছেন— "আপন মনে লিখে খাতাতেই রেখে দিতাম। দেবকুমার বসু আমার কবিতার বই প্রকাশ করতে রাজি হলেন। আমি তখন আমার পুরানো কবিতার খাতা ফের পড়তে লাগলাম। প'ড়ে মনে হলো, গোটা পঞ্চাশ কবিতার মধ্যে কবিতাপদবাচ্য বলা যায় গোটা পাঁচেককে। মনটা খুব দমে

গেলো। তখন নতুন কিছু কবিতা লিখতে গেলাম। সব পয়ারে। বাছাই ইত্যাদি ক'রে অতি ছোটো একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করা যায় ব'লে দেখা গেলো। দেবকুমারবাবু অতি সজ্জন। তিনি বললেন, 'চলুন দেবুদার কাছে, মলাট এঁকে নিয়ে আসি।' চললাম তাঁর সঙ্গে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, বেলেঘাটায়। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে তিনি একটা ছবি এঁকে দিলেন। অতি সুন্দর হলো দেখতে।

"বই ছাপা হয়ে বেরোলো। মোটা ষাট পাউন্ড অ্যান্টিক কাগজে ছাপা। জানা-শোনা কয়েকজনকে দিলাম পড়তে। কিন্তু কেউ আমার কবিতা সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য সুরু করলো না, প্রশংসাও করলো না। দেবকুমারবাবু নিশ্চয়ই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ও দিয়েছিলেন। কেউ ভালো ক'রে রিভিউও করলো না। সব চুপচাপ, যেন আমার বই প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'।"[১১৬] সময়টা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন, ইংরেজি ১৯৫৮ খ্রিঃ। বিনয় মজুমদার এমন একজন কবি, যাঁর প্রথম কাব্যটির একটি কবিতাও কোনও ম্যাগাজিনে কখনও প্রকাশিত হয়নি। সরাসরি বই লিখে কাব্যজগতে আবির্ভাবের আর কোনও উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে আছে কিনা কে জানে! সমাদৃত হলেন না বটে, কিন্তু কবিতার ফুলে সাজি ভরে জেতা বাজি হারতেও ততদিনে মনকে রাজি করানো তাঁর সারা। ধরাবাঁধা চাকরির বদলে শুয়ে-বসে বছর কাটাচ্ছেন, পড়ে ফেলছেন প্রচুর বিদেশি সাহিত্য। নিজমুখে বলছেন— "ধীরে ধীরে আমার মনে কবিতা রচনার একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবির্ভূত হয়।"[১১৭]

'নক্ষত্রের আলোয়'–এর প্রকাশকালীন শিহরণ জীর্ণ হতে থাকে, মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি হিসেবে বিনয়কে স্বীকৃতি দিতে প্রকাশককুল তবুও তখনও নারাজ। রোমন্থনে বিনয়ের উষ্মা ধরা পড়ে— "এই ১৯৫৯ সালে আমায় বেশ কিছু অনুবাদ করতে হয়। পাইকপাড়া থেকে 'বক্তব্য' নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন বিমান সিংহ। আমি থাকতাম গ্রামে; আমার গ্রামের ঠিকানায় তিনি প্রায়শই চিঠি দিতেন অনুবাদ কবিতা প্রার্থনা ক'রে। আমি অনুবাদ ক'রে পাঠাতাম এটা ঠিক। কিন্তু তিনি আমার নিজের লেখা কবিতা কেন চান না— এ ক্ষোভ আমার মনে মনে থাকতো। কিছু বিরক্তও বোধ করতাম। আমি যে কবিতা লিখি তা সে সম্পাদক জানতেন, 'নক্ষত্রের আলোয়' তিনি পড়েছিলেন। তবু কখনো আমার নিজের লেখা কবিতা চাইতেন না।"[১১৮] একই সঙ্গে পঞ্চাশের কবিস্বরে তিনি যে বেমানান, তীব্র সচেতনায় তাও অনুধাবন করছেন।[১১৯]

এই সময়ে কবি বিষ্ণু দে-র বাড়িতে তাঁর খসড়া কবিতার খাতাগুলি বিনয় মাঝেমধ্যে রেখে আসতেন। ১৯৫৮-য় বিষ্ণু দে-র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার একটি সংখ্যায় 'পাখি' নামে বিনয়ের একটি কবিতা বেরিয়েছিলো। 'সাহিত্যপত্র'-এর আরও কয়েকটি

সংখ্যায় ছাপা হয়েছিলো আরও কিছু কবিতা। কিন্তু, " 'নক্ষত্রের আলোয়' বইখানা পাঠক-সমালোচক মহলে সমাদৃত না-হলে আমি খুব ভাবিত হয়ে পড়লাম।"[১২০]—বিনয় বলছেন। সম্ভবত, এই সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ [নৈঃশব্দ্য]' বইটি বিনয়কে উপহার দিয়েছিলেন, বিনয় পড়েও ফেললেন নিবিষ্টতায়। পঞ্চাশ শেষ, নব্য দশকের গোড়ায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জীবনের বাকি সমস্ত কিছুর প্রতিতুলায় বিনয় বসিয়ে ফেলছেন কবিতাকে। এখানে একটা কথা বলতেই হবে যে, তাঁর পঞ্চাশের সতীর্থরা কবিতায় যে প্রতিষ্ঠানবিরোধী বিপ্লব এঁকেছেন, ক্যালেন্ডার পাল্টে যাওয়ার পর আস্তে-আস্তে তাঁরাই প্রতিষ্ঠান হয়ে বসবেন। অন্যদিকে, জীবন ও কবিতার চরিত্রে তাঁদের ভিন্ন মেরুর অধিবাসী হয়েও জীবনের সবরকম সম্ভাব্য দাবার ছক বিনয় উল্‌টে দেবেন শুধুমাত্র কবিতার ভালোবেসে। বিনয়ের কথাতেই বিনয়কে চিনে নিই তাহলে— "এরপর ১৯৬০ খৃস্টাব্দের একেবারে গোড়ার দিকে আমি স্থির করলাম সর্বান্তকরণে কবিতাই লিখি। চাকুরি আপাতত থাক। গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চ'লে এলাম। সকালে জাগরণ থেকে শয়ন পর্যন্ত সারাক্ষণ কবিতাই ভাবতাম। আশেপাশে শহরের যে দৃশ্যাবলী দেখতাম তার কোনো কিছু কাব্যিক মনে হলে তখনি নোট বুকে টুকে রাখতাম। ছোটো আকারের কবিতার নোট বই সর্বদাই প্যান্টের পকেটে রাখতাম!

"সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম জড়ের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য, মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এবং তাদের জীবনের ঘটনাকে মানুষের জীবনের ঘটনা ব'লেই চালাতে লাগলাম। এইভাবে শুরু হলো কবিতার জগতে আমার পথযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'।"[১২১]

এরপর থেকে বিনয়ের রুটিন কবিতা, আর জীবন বুঝি রংরুটে আত্মধ্বংসী অনিবার্য পরিণতির দিকে ছুটেছে। বিনয়ের একটি কবিতা আছে এরকম—

"প্রেসিডেন্সি কলেজে শেষ পরীক্ষা হওয়ার আগে না পরে

ঠিক মনে নেই– হতো ছাত্রদিগের নাটক অভিনয়।

আমার মাধ্যমিক বিজ্ঞান-এর ছাত্রদেরো নাটক

অভিনয় হলো– বনফুলের লেখা 'কবয়ঃ নাটকটি।

সত্যব্রত হল রাজা, অতীন হল রাজকন্যা,

আমি হলাম ধ্রুবেশ গুড়– আধুনিক কবি ধ্রুবেশ গুড়।

লেখক হলো সুনীল দে, আরও আছে– নাপিত হলো

অনিন্দ্যসুন্দর। আমার পার্ট এখনো কিছুটা মনে আছে :

জামাইকা দ্বীপের বন্দরে আছে যত শামুকী

নিকোলাসের পিতৃশ্বসার রিপ্রেশন

উঠুক কিংবা নামুকই

ভলভিউলাস, ফটোমীটার, নীটসের যত ফুক্কড়ী

সব তুচ্ছ তোমার কাছে চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী।

বলা বাহুল্য রাজকন্যার নাম চন্দ্রমুখী।"[১২২]

'গায়ত্রী' বা 'কবিতা'-কে 'চন্দ্রমুখী' বলে ধরে নেওয়া যায়, অথবা গায়ত্রী-ই বিনয়ের কবিতা, কবিতাই গায়ত্রী মন্ত্র! পুংসর্বস্ব নাটকের রাজকন্যাটি ছিলো পুরুষ, তাই অচ্ছুৎ আর জীবননাট্যের স্বপ্নে দেখা রাজকন্যাটি বিনয়ে অচ্যুত, তাই রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে কিংবা প্রগাঢ় বিনয়ে তরুণ কবির পালকই খোলেনি। উত্তর মেলে না।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বিনয়ের দ্বিতীয় কবিতার বই 'গায়ত্রীকে' প্রকাশিত হয়। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে তাঁর শেষ চাকরিটির সময়ে এই কবিতাগুলি লেখা হয়েছিলো। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ফিরে এসো, চাকা' থেকে 'গায়ত্রীকে'-র প্রথম কবিতাটির রচনাকাল ৮ মার্চ ১৯৬০ বলে জানা যাচ্ছে। আবার একট স্মৃতিচিত্রণে বিনয় জানাচ্ছেন— "১৯৫৯ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে আমি আমার বন্ধু মিহির ঘোষদস্তিদার-এর পাইকপাড়াস্থ বাসভবনে অতিথি হয়ে মাস কয়েক ছিলাম। মিহিরের বাড়িতেই 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রথম কবিতাগুলি লিখি।"[১২৩]

মাত্র চোদ্দটা কবিতা নিয়ে 'গায়ত্রীকে'-র কায়া ধরা। প্রথম প্রকাশ ২৫ ফাল্গুন ১৩৬৭, মার্চ ১৯৬১। প্রকাশক : দেবকুমার বসু, 'গ্রন্থজগৎ'। প্রয়োজন নেই, তাই উৎসর্গও নেই গ্রন্থটিতে। কেননা, নামকরণটিই তো উৎসর্গীকৃত![১২৪] জ্যোতির্ময় দত্ত দিনক্ষণ ও কবিতালিখনের হিসেব মিলিয়ে চমৎকার বলেছেন— " 'ফিরে এসো, চাকা'-র ৭৭টি কবিতার

রচনাকাল ৮ই মার্চ ১৯৬০ থেকে ২৯ জুন ১৯৬২। এরভ মধ্যে সাতটি কবিতা '৬০ সালে (যার মধ্যে চারটি অক্টোবর মাসে) রচিত। ১৯৬১-র ১৩ জুন পর্যন্ত নীরবতা। জুন ও জুলাই '৬১-তে বিনয় মজুমদারের অবরুদ্ধ ঝরণা আবার পাথর সরিয়ে পর-পর এগারোটি অলৌকিক লিরিক উৎক্ষেপ করলো। ১৯শে জুলাই তিনি লিখলেন "বেশ কিছুকাল হল চলে গেছ [গেছো] প্লাবনের মতো" এবং "নেই কোন [কোনো] দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া"। ২০শে জুলাই লেখা হল চারটি কবিতা,- যার যে কোন একটি লিখতে পারলেই কবিতার ইতিহাসে অমরত্ব নিশ্চিত।"[১২৫]

সম্ভবত, সাতাত্তরের চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যক কবিতাই বিনয় সে-সময় লিখেছিলেন। 'গায়ত্রীকে' 'ফিরে এসো, চাকা'-য় পরিবর্তিত হলে কাটাছেঁড়ার সময় কিছু নতুন কবিতা গ্রহণের পাশাপাশি পুরনো কিছু লেখা বাদও দেওয়া হয়।

অর্থাৎ 'ফিরে এসো, চাকা'-র ১ম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ফিরে এসো, চাকা', প্রকাশক 'গ্রন্থজগৎ'-এর পক্ষে শ্রী দেবকুমার বসু, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর। উল্লেখ্য, দিনটি বিনয়ের ঊনত্রিশতম জন্মদিন। 'ফিরে এসো, চাকা' এরপর 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন। ১৯৬৫-র ৩১ জুলাই প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-তে 'আমার ঈশ্বরীকে'-র সমস্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে আবার 'ফিরে এসো, চাকা' নামে এই গ্রন্থের কোলকাতা সংস্করণ প্রকাশ করেন বুদ্ধদেব বসু-কন্যা মীনাক্ষী দত্ত, ১ মার্চ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। এই সংস্করণটির পর 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি আর বদলায়নি, প্রকাশক পাল্টেছে অবশ্য। বর্তমানে সহজলভ্য 'অরুণা' সংস্করণটি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে বাজারচলতি রয়েছে।

কবিতা-রুচির ব্যাপারে বিনয় প্রাচীনপন্থী, এ-কথা সত্যি। তবে, আরও বেশি সত্যি কবি ও কবিতার শুচিতার ব্যাপারে তিনি একশো শতাংশ খাঁটি ও সৎ। এই কারণেই বোধ হয়, সত্যিসত্যিই বিনয়ের কোনও দশক নেই। 'ফিরে এসো, চাকা'-র দশকের কবিদের (পবিত্র মুখোপাধ্যায়, তুষার চৌধুরী, ভাস্কর চক্রবর্তী, মলয় রায়চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ গুহ প্রমুখ) কাব্যভাষার সঙ্গেও বিনয়ভাষ্যের দুস্তর ব্যাবধান। বিশ-এর পঞ্চাশ থেকে একুশ-এর শূন্য ইস্তক বিরাট শিশু বিনয় স্বনির্মিত বিশ্ব নিয়েই খেলে গেছেন।

পঞ্চাশ-ষাটের লগ্নে তাঁর সমসাময়িক সমবয়সী, কিছু অগ্রজ, কিছু অনুজ দেশি-বিদেশি কবিকুল কী ভাষায় কথা বলছে, তা দেখলে বিনয়কে আমাদের অশ্বিনী তারার দূরবর্তী কবি বলে হয়তো মনে হবে। ক্রমবর্ধমান হাস্যময় ভিড়ে একটি বিষণ্ণ, বোকা লোক হয়ে অবলুপ্ত

মিশে যেতে যেতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চারণ করেন— "তোমরা ফিরে যাও! কোথায় দ্বারকায়/ নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ;/ কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়/ আহত নেকড়েরা; এমনই যুদ্ধ!/ কী হবে ঘুম থেকে সে-দেশে হেঁটে গেলে?/ সুদর্শন আমি দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে।/ এখানে এই ঘাসে হৃদয় ঢেকে নিয়ে/ ঘুচাবো দ্বন্দ্বের জয়ের ক্লান্তি—// ব'লো না কথা পাখি, আস্তে ঝরো ফুল;/ ঘুমের রাত আসে। শান্তি শান্তি!"[১২৬]; শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন— "...আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে / নামলে সমুদ্র স'রে যাবে শীতল স'রে যাবে মৃত্যু স'রে যাবে।/ তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার/ থাকবো, বা অন্ধকার হবো।// আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।"[১২৭]; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলে ওঠেন— "এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে/ কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে/ রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে/ এ-যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।// এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার/ রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।।"[১২৮]; "এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায় থাকে শুধু পরিত্রাণহীন/ ব্যক্তির আবর্তে ঘূর্ণিঘোর, কার শির ছেঁড়ে সুদর্শন?/ 'মিথ্যাচারী মিথ্যাভাষী, শঠ, আমিই মহান, দেখ আমাকে'— / ছিন্ন হয়ে যায় শিশুপাল এক দশকে সঙ্ঘ ভেঙে যায়!"[১২৯] বলেন শঙ্খ ঘোষ; "এ-ওর শরীর নিয়ে গন্ধ শুঁকছি সন্ধেবেলা— সন্ধেবেলা/ এ-ওর বুকের মধ্যে উঁকি মেরে কোথায় দুঃখ পাপ/ লুকোনো টাকার মতো রয়ে গেছে, কোথায় ঈশ্বর/ টুপি খুলে হাঁটু মুড়ে/ বসে আছেন, চেয়ে দেখছি— পোস্ট-মাস্টারের মেয়ে শুধুমাত্র জুতোজোড়া নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে/ তার সঙ্গে গোলাপি যুবক— তারা স্বর্গে যাবে// আমাদের স্বর্গ নেই স্যারিডন আছে"[১৩০]— ভাস্কর চক্রবর্তী; পাশপাশি বিনয় লিখছেন— "কেবলি বিষয়বস্তু খুঁজে খুঁজে অবশেষে কবি ভেবে দ্যাখে,/ সমগ্র বৎসরব্যাপী প্রকৃত মানুষদের প্রজননঋতু।/ তা ছাড়া অন্যান্য প্রাণী বছরে একটিবার সে সুযোগ পায়।"[১৩১] বা, "যে-কোনো কাহিনী তাই শুধুমাত্র যৌনাঙ্গের আত্মকাহিনীই,/ যে-কোনো চিন্তাই তাই চিন্তাকারীটির একক জীবনী/ হয়ে যায়, হতে হয় তথাকথনের দোষে যাকে তুমি বলো/ অবচেতনার রূপ;/ সব চুপ, চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে/ কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া, সেতু।"[১৩২]

স্কটল্যান্ড জয় করে লিভারপুলে এসে 'সিলভার' মুছে ফেলে 'বিটল্‌স'-এর জন লেনন, জর্জ হ্যারিসন, পল ম্যাককার্টনি প্রমুখ 'দ্য বিট্ বয়েজ' যথার্থই আমজনতার গায়ক হয়ে উঠছেন। ১৯৬১-তে প্রকাশিত 'কাদ্দিশ'-এ গীন্‌স্‌বার্গ পরমাণু বোমাবাজি ও যুক্তরাষ্ট্রের সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শানাচ্ছেন— "America I've given you all/ and now I am nothing/ America two dollars and/ twenty seven cents January 17, 1956/ I can't stand

my own mind/ America when will we end/ the human war?/ Go fuck yourself with your atom bomb."[১৩৩]; তামাম বিশ্বে তখন যুদ্ধবিরোধিতার মন হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসছে, আরেক বিখ্যাত মার্কিন গানলেখক বব ডিলান লিখে ফেলছেন যুদ্ধমুক্ত পৃথিবীর জন্য রেখে যাওয়া শ্রেষ্ঠ পঙক্তিগুলির একটি— "How many roads must a man walk down/ Before you call him a man?/ Yes, 'n' how many seas must a white dove sail/ Before she sleeps in the sand?/ Yes, 'n' how many times must the cannonballs fly/ Before they're forever banned?/ The answer, my friend, is blowin' in the wind/ The answer is blowin' in the wind"[১৩৪], বিনয় 'ফিরে এসো, চাকা' থেকে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র দুনিয়ায় রওনা হলেন। পাড়ভাঙনের অনিবার্য স্বেচ্ছাচারী কলরোল তাঁর কবিতাকে মুখরিত করেনি। নব্যদর্শিতার অভাবে দিব্যদর্শী হতে পারলেন না কবি। ক্ল্যাসিফায়েড ভাষা, ট্র্যাডিশনাল বিউটিফায়েড ভঙ্গিমায় তখনকার মতো উতরে গেলেও ভাবগত ক্ষেত্রে উত্তরণ হলো না তাঁর।...

'ফিরে এসো, চাকা'-র রচনাকালপর্বে একবার ছেদ পড়ে। বিনয়ের মধ্যে মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা গেলো এই প্রথম। ১৯৬১-তে মানসিক হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি পর্যন্ত হতে হলো। সাড়ে পাঁচ মাস পর ছাড়া পেলেন, ২৯ জুন ১৯৬২-তে কাব্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করলেন তিনি। এর মাঝখানে দুর্গাপুরে চাকরি করা ও ছাড়ার ঘটনাটিও আসবে। 'ফিরে এসো, চাকা'-র নামকরণ নিয়ে সন্তোষজনক কিছুই বিনয় কখনও বলেননি, বলতে চাননি। উল্টে একাধিক উদ্দেশ্য বিধেয় দাখিল করে উৎসাহীজনকে বিড়ম্বিত করে গিয়েছেন। বিনয়-অনুরাগী সম্পাদক শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে বিনয় একবার জানিয়েছিলেন— "আমার এক বন্ধু ছিলো, নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরে আমার সঙ্গে পড়তো। এক বছর পড়ার পর ইংল্যান্ডে চ'লে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু সেখানে পড়া শেষ না-ক'রেই বাড়ি ফিরে আসে বছর দুই ইংল্যান্ডে থেকে। সরোজ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি. পাশ। সুতরাং দেশে ফিরে 'মেটালবক্স' কোম্পানিতে চাকরি পায়। চৌরঙ্গী রোডে 'মেটাল বক্স' কোম্পানির অপিসে গিয়ে দেখি সরোজের দরজায় লেখা : 'সরোজ চাক'। 'চাক'-এর স্ত্রী-লিঙ্গ 'চাকা'। গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই আমি 'গায়ত্রী চাকা' বানিয়েছি। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটির নামকরণের ইতিহাস এই।[১৩৫]

'ফিরে এসো, চাকা' উৎসর্গ করা হয়েছিলো গায়ত্রী চক্রবর্তীকে। 'গায়ত্রীকে'-র নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় একটি একান্তকথায় বলেছেন— "আরে ধ্যুৎ, আমার সঙ্গে তিনচার দিনের আলাপ— প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের— তারপর কোথায় চলে গেলেন— আমেরিকা না কোথায় ঠিক জানি না।"[১৩৬] আবার কোথাও বলছেন—

"ওর সাথে আলাপ হয়েছিল ওদেরই বাড়ীতে। আরে বাপু! কি হয়েছে, বি.এ. ক্লাসে ইংরাজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সে কবিতা তো বুঝত নিশ্চয়ই! আলাপ তো বাড়ীতেও হয়েছিল আর কফি হাউসেও।..."[১৩৭] গায়ত্রীকে ভালোবাসতেন কিনা প্রশ্নের উত্তরে বিনয়ের হেঁয়ালিপূর্ণ জবাব ছিলো— "কাউকে নিয়ে তো লিখতে হয়— আমগাছ, কাঁঠালগাছ, রজনীগন্ধা নিয়ে কি চিরকাল লেখা যায়?"[১৩৮] এ বিষয়ে বিনয় এর চেয়ে বেশি ভাঙলেন না আর কোনওদিনই।...

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়; শুধু তাই নয়, তাঁর 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটির তিন-তিনটি সংস্করণও বিনয় প্রকাশ করলেন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে । তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

"ঈশ্বরীর

বিনয় মজুমদার

এটিকে তুমি একটি বাক্য হিসেবেই গ্রহণ করো। অর্থাৎ ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার। এটা একটা বাক্য। এটা যে বই-এর নাম সে-কথা আপাতত ভুলে যাও। সাধারণ একটি বাক্য হিসেবেই পড়ো। নামপত্রেও ছাপা বাক্যটি ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার অর্থাৎ বিনয় মজুমদার কার? ঈশ্বরীর। অর্থাৎ আমি তখন এমন আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীর হাতে সমর্পণ করেছিলাম, বাঁচবার জন্য।"[১৩৯] তাঁর কথায়— " 'ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পালটে কেন আমি 'আমার ঈশ্বরীকে' করেছিলাম তার কারণ সোজা। তখন আমি আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম।"[১৪০]

এই বছরটি বৈশ্বিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ভীষণ টালমাটাল। পঞ্চাশের বিট্ আন্দোলনের প্রতিসরণ থেকে তৈরি হয়েছিলো হিপি প্রজন্মের আন্দোলন (Hippie/ Hippy Generation Movement)। ঝাঁ-চকচকে ড্রয়িংরুম, আলো-আঁধারি রেস্তোরাঁ বা পানশালায় ভদ্দরলোকের দেখনদারি শান্তিকাম, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ধমনী-শিরায় লালিত বর্ণবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ইত্যাদি দ্বিচারিতা, কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে হিপিরা প্রতিবাদী হয়। কড়া দাগের যৌনতা, মাদকসেবন, খাবার, স্বাস্থ্য, মূল্যবোধ, শিক্ষা, ধর্মপালন, ভ্রমণ, যোগাযোগরক্ষা, সংস্কৃতি— এককথায় গোটা জীবনপ্রণালী দিয়েই হিপিরা ছিলো মারকাটারি এই পার্থিব পৃথিবীর প্রতিপক্ষে। ১৯৬৪-তে হিপি আন্দোলন বৃহদাকার ধরে। হিপিদের প্রাণপুরুষও বিট্ গদ্যকার জ্যাক কেরুয়াক।

হাংরি জেনারেশনের আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিলো ১৯৬৩-'৬৪-তে। স্রষ্টারা :

বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য এবং শৈলেশ্বর ঘোষ। বাংলা ভাষার সাহিত্যে সংঘটিত একমাত্র এই আন্দোলনটিকেই 'আভাঁগার্দ আন্দোলন' বলে চলে।[১৪১] হাংরি কবিতায় যখন লেখা হচ্ছে— "...,আজ একটি বিষণ্ণ বালক ভেসে যায় নিমতলা/ শ্মশানের দিকে— কী কষ্ট অথবা কী সুখ— আট বছর বয়েসে মৃত্যুকে/ সাক্ষাৎ দেখি, দেখি কী রহস্যময় অস্বস্তিকর মানব জন্মদেয়া/ হয়েছে আমাকে, রহস্যের ভিতরে শূন্যতা আবার রহস্য আবার শূন্যতা রহস্য/ যতোদ্রুতসম্ভব বিষাক্ত হয়ে গেছে ভালোবাসা আমার/ সেই পবিত্র অস্তিত্ব, সেই অসম্ভব শুদ্ধ, ঈশ্বরের মতো আমার আত্মা/ তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি ক্রমশ ভুল সভ্যতার/ শায়া তুলে ফেলি—"[১৪২]; বিনয় তখন কোনও কল্পিত করবী কুসুমে বুঁদ। বাঁধছেন— "এই সব দ্বৈতকার্য— লালাময় ক্রিয়াকলাপেরা/ ফুলকো লুচির মধ্যে ঘিয়ে সিক্ত আঙুলের যাতায়াত ব'লে মনে হয়।/ কার্য সমাপন হলে ছায়ার মতোন এসে এসে ছায়া দেয় সাবলীল ঘুম;/ পরস্পর আলিঙ্গনে শুয়ে থাকি আমি আর করবী কুসুম।"[১৪৩] জাতীয় পঙক্তিসমাহার! 'ফিরে এসো, চাকা'-র ধ্রুপদী প্রেম ক্রমশ আদিরসময় হয়ে আসছে। বিনয়ের 'ঈশ্বরীর' পর্বকে 'বাল্মীকি' পর্বের বীজখেত বললেও ভুল হবে না।

সুনীল তাঁদের উপর গীন্‌স্‌বার্গের প্রভাবের কথা স্বীকার করেন না। 'কৃত্তিবাস'-এর কবিতাভুবনে নয়, গীন্‌স্‌বার্গ হাংরি কবিতার মানচিত্রেই অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে তাঁর মত। আবার প্যাপিরাস-প্রকাশিত (১৩৯৩ বৈশাখ ১) ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস সংকলন', ২য় খণ্ডের ভূমিকায় সুনীল বলেছেন— "অ্যালেন গীন্‌সবার্গের প্রভাবেই কি না জানি না, এই সময় কৃত্তিবাস লেখক-গোষ্ঠীরই একটি অংশ হাংরি জেনারেশন নামে একটি আন্দোলন শুরু করে। প্রায় একই লেখকগোষ্ঠী হলেও কৃত্তিবাস পত্রিকা ঘোষিত ভাবে হাংরিদের সঙ্গে সম্পর্ক-বিযুক্ত থাকে, আমি নিজেও কখনো হাংরিদের দলে যোগ দিই নি। দু-এক বছরের জন্য হাংরি জেনারেশনের আন্দোলনের সোরগোল কৃত্তিবাসের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল হয়েছিল এবং তা একদিকে টাইম ম্যাগাজিন অন্যদিকে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আমি হাংরিদের থেকে সব সময় দূরে দূরে রইলেও অশ্লীলতার অভিযোগে যখন শ্রীযুক্ত মলয় রায়চৌধুরীর বিচার হয়, তখন আমি তার পক্ষ সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম।..."

'সম্প্রতি' পত্রিকার তৃতীয় সংকলন (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)-এ 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব' সূচক লেখাটিতে 'হাংরি জেনেরেশান' অংশটির সঙ্গে, প্রসঙ্গে বিনয়ের 'গায়ত্রীকে' নিয়ে সমালোচনা লিখেছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। শক্তির সমালোচনাটিতে ছিলো— "মানুষের চরিত্রের, শিল্পবোধপূর্ণ মানুষের অনুভব ক্ষমতার মধ্যেও যে লুডিক্রিটি আছে তা ভারি অদ্ভুত, চিরাচরিত ভাবে নয়, দুর্গম হয়ে উপস্থিত হয়েছে তাঁর কবিতায়— সংকল্পের মতোই : ...

"...,মানুষ বলে ফুল বলে গন্ধ, কিন্তু রন্ধনকালীন মাংসের গন্ধে আন্তরিকভাবে উচাটন হয়। এই-ই মানুষ, উপায়হীন পেট-পোঁদসমেত মানুষের চরিত্র এরূপই।..."[১৪৪] নিজেদের ক্ষুৎকাতরতা জাহির করতে হাংরি আন্দোলনের প্রোপ্যাগান্ডা করে শক্তি সেইদিন বিনয়ের পুস্তিকা থেকে কিছু পঙক্তি সংগ্রহ করেছিলেন। সমালোচনাটির উপসংহারে এসে শক্তি বললেন— ...বিনয়ের পদ্যের যে-পাঠক সে বিনয়ের কবিতা পড়লেই, তার অনুভবক্ষমতা যদি যথাযথ হয়, তবে বিনয়কে অনুভব করবে, বিনয়ের পদ্যের জগৎ বিশেষ ক'রে এর পরবর্তী পদ্যগুলি উপরোক্ত গোত্রের আন্দোলনকে অনেক জাগ্রত করে।"[১৪৫] 'সম্প্রতি'-র সেই সংখ্যাতেই বিনয়ের লেখা 'কী যে হবে কী যে হয় নামের কবিতাটি প্রকাশ পেয়েছিলো। সে-সময় তুঙ্গে উঠেছিলো হাংরি আন্দোলন। বুলেটিন বেরিয়েছিলো। কফি হাউসের টেবিলে টেবিলে ছড়ানো হয়েছিলো ইস্তেহার। হাংরি কবি হিসেবে বিনয়ের নাম যেখানে-সেখানে ছাপা হয়। আর তার সামান্য দিনের ব্যাবধানে হাংরি গোষ্ঠীতে ফাটল ধরলে আশ্চর্যজনকভাবে হাংরি মতাদর্শে বিশ্বাসী কবি না হলেও বিনয় হাংরিদের পক্ষ নিয়ে শক্তি, সন্দীপন প্রমুখকে আক্রমণ করে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিচিত্র ভাষায় একটি লিফলেট ছাপিয়ে প্রচার করেছিলেন ১৯৬৪-র ১০ জুন। মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের ১৬ নং পৃষ্ঠায় লিফলেটটি দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরক্ষণেই বিনয় ১৮০ ডিগ্রি কোণে ঘুরে গিয়ে বলছেন— "হাওয়ায় 'হাংরি' দলের জনক করা হল আমাকে...আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ আমার পক্ষে কোনো দলের নিয়মে থাকা অসম্ভব।"[১৪৬]

শক্তির বিনয়-আলোচনার সূত্রে প্রভাতকুমার দাস একটি আকর্ষক তথ্যের উর্দ্রেক করেছেন। 'সম্প্রতি'-র সম্পাদক প্রয়াত অশোক চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক দাসকে কথায়-কথায় জানিয়েছিলেন যে, মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত তাড়িত বিনয় শক্তির লেখাটির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নাকি অশোকবাবুকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। "তাঁর ধারণা, এই বিশ্বসংসারে শক্তি কেন,— কারো পক্ষেই বিনয়-এর কবিতা বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে পারেন একজনই, যে মানুষীর উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং বিনয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, বিনয়-এর পত্রটি যেন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ হয় এবং আলোচ্য সমালোচক এবং সম্পাদক উভয়কেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে 'সম্প্রতি'র মাধ্যমে। নিতান্তই প্রলাপ বলে, কবির সেই চিঠি উপেক্ষা করেছিলেন সম্পাদক, এমনকি দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি সংরক্ষিত হয়নি তার কারণ বিনয়-এর কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এ চিঠি যে কোন সময় গুরুত্ব পেতে পারে এমন কথা হয়তো তিনি ভাবেননি। একথা ঠিক, হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিনয় কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেননি, কিংবা তাঁদের কাব্যাদর্শের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট কোন সংযোগ ছিল বলে মনে হয় না।...তবুও একথা সত্যি, 'সম্প্রতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তির 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়' বিনয়-এর কাব্য বিষয়ে

সমকালীন পাঠক পাঠক ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন, অনেকেই তাঁর কবিতা নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশে আগ্রহ পোষণ করেন।[১৪৭]

'ফিরে এসো, চাকা'-র নাম, নামপরিবর্তন নিয়ে দড়ি টানাটানি চলার সময়েই বিনয়ের অন্নকষ্টের দিন শুরু হয়। মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত কবি ৫৯ বি, সূর্য সেন স্ট্রিটের কল্যাণ হোটেলে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে উন্মত্ত ক্রোধের বশে হোটেলের ঠাকুরকে গুরুতর আঘাতে জখম করে প্রথমবার হাজতে যাচ্ছেন। তাঁর জীবন ততদিনে মন্থনের সত্যবিষ তুলতে শুরু করেছে, জীবিকা অবলম্বনের স্থিতাবস্থা নেই। কবিতা, স্বভাববিপ্লবের মতোই সন্তান চিবিয়ে খাচ্ছে! একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় বলছেন সেদিনের কথা— "উৎপলকুমার বসু, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়— এরা সবাই মিলে চেপে ধরল আমায়। যে এরপরে মশাই আর কোনও চাকরিতে আপনি যাবেন না। আমি বললাম— টাকা পাব কোথায়? খাব কি? বলল যে— আমরা চাঁদা তুলে আপনাকে খাওয়াব। এই সময়ে স্টেটসম্যান-এ আমার বইয়ের একটি রিভিউ বেরোল। স্টেটসম্যান লিখেছিল— কবি বিনয় বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন দখল করে নিল। এই রিভিউটা পড়ে আমি ভাবলাম যে, আচ্ছা ঠিক আছে— তো এরা যখন বলছে তখন দেখি চেষ্টা করে পারি কিনা। আর অন্য কবি যারা ছিল তারা বলল— মশাই আপনি ইঞ্জিনিয়ার। আমরা ইঞ্জিনিয়ার না। কেউ সাংবাদিক , কেউ শিক্ষক, কেউ অধ্যাপক আমাদের কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু আপনি ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে আর কবিতা লেখা হবে না। চাকরি না করে তারপর আমি ছিলামও বটে। ওরা চাঁদা তোলা শুরু করল বটে এবং দিয়েওছিল বছরখানেক, বছর দেড়েক। তারপরে কিন্তু চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে দিল। আমি অত্যন্ত, অতিশয় কষ্টে (আবেগজড়িত কণ্ঠে) দিন কাটিয়েছি তারপর।"[১৪৮] একথা কিন্তু ঠিক যে, বিনয় কোনও আত্মকথা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতিতে কখনওই কিন্তু চাকরি তাঁর কাছে গলগ্রহ হয়ে উঠেছে, এমন কিছু বলছেন না। গীন্‌স্‌বার্গের কাব্যযাপনের আদর্শে ব্রতী সুনীল (আনন্দবাজারী হয়ে ওঠবার আগে) যেমন কেরানির চাকরি হেলায় ছেড়েছিলেন, দীপক মজুমদার যেমন চাকরি গ্রহণের কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি, বিনয় তেমনই একের পর এক চাকরি পেয়েও ছেড়েছেন, বরং বলা যেতে পারে।

শুধুমাত্র কবিতাপ্রাণতাই তখন বিনয়কে রন্ধ্রে, মর্মে, মূলে তুমুল আত্মবিশ্বাসে জারিয়ে দেয়। কবিবন্ধুর আয়োজিত সাহিত্যিক আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন না; নিজের সৃষ্টি, সৃষ্টিজগৎ সংক্রান্ত মগ্নতা থেকে বলছেন— "তখন 'আরো কবিতা পড়ুন' নামক আন্দোলন খুব জোর চলছে। মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে ছোটো মিছিল যেতো। শ্লোগান দিতো 'আরো কবিতা পড়ুন', হাতে থাকতো ফেস্টুন। যতদূর মনে পড়ে তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তরুণ কবিরা

বক্তৃতাও দিতো, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। দেখেশুনে আমি বলতাম, 'আমি এখন যা লিখছি সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। তার মানে ভবিষ্যতে আমার কবিতা ছাত্রছাত্রীরা পড়তে বাধ্য হবে। সেহেতু এখন আমার পাঠক না-থাকলেও চলে'। এবং কবিবন্ধুদের বললাম যে মিছিল ক'রে কিছু হবে না। আসল কথা হচ্ছে ভালো লেখা দরকার। যখন কবিতার বই ছেপে খাটের নিচে রেখে দেবে, কারো কাছে বেচতে যাবে না, তা সত্ত্বেও পাঠকেরা এসে খাটের নিচের থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়বে তখনই বুঝবে কবিতা ঠিক লেখা হচ্ছে। আমার এ-মন্তব্য কিন্তু কবিবন্ধুদের ভালো লাগেনি।"[১৪৯]

তবে 'গায়ত্রীকে' বিনয়ের প্রথম পাঠক তৈরিতে খানিক সাফল্য পেয়েছে। 'সম্প্রতি'-তে বেরনো সমালোচনাটিও কিয়দংশে কার্যকরী হলো। কবিতা লেখার অনুরোধ নিয়ে কিছু লিটল ম্যাগাজিন কাছে এলো তাঁর। দুর্গাপুরনিবাসী বিনয় সাতাত্তরটি কবিতার পাণ্ডুলিপি 'গ্রন্থজগৎ'-এর সর্বশ্রী দেবকুমার বাবুকে পাঠালেন। চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে কোলকাতায় প্রুফ দেখতে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। কবিতা বা ইতিহাস 'ফিরে এসো, চাকা' জন্ম নিলো। প্রথম সংস্করণে মুদ্রণপ্রমাদও থেকে গেলো কিছু কিছু।[১৫০] বেশ কয়েক মাসের অকথ্য বন্দিজীবন কাটানোর পর '৬২-তে মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে 'ফিরে এসো, চাকা' সমাপ্ত করেছিলেন কবি। প্রকাশনার পর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হাতেই গ্রন্থটি সমালোচনার জন্য তুলে দিয়েছিলেন। 'সম্প্রতি' পত্রিকারই পঞ্চম সংকলন (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)-এ বিনয় শক্তির কলমে ফের চর্চিত হচ্ছেন। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বিনয় বললেন— "...সমালোচনার ফলে হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো কলকাতায়।"[১৫১]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জোরাজুরিতেই যে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে বিনয়ের সংযুক্তি ঘটেছিলো, সে-কথা আগেই বলেছি। সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আয়ওয়া ইউনিভারসিটির কবিতাবিষয়ক কর্মশালায় আমন্ত্রিত হয়ে তখন বিদেশে। অন্তর্বর্তীকালীন সম্পাদক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কৃত্তিবাস'-এর অভ্যন্তরে বিবাদের বিষবৃক্ষ ভাঙনের ভয় ছড়াচ্ছে। উপরন্তু, ক্রমায়ত হাংরি বাতাসে পত্রিকাসন টলোমলো। সেই সময়েই পত্রিকার অষ্টাদশ সংকলনে বিনয়ের 'একটি প্রস্তাব' নামে একটি কবিতা এবং ঊনবিংশ সংকলনে আরও তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বিশতম সংকলনে কবি হিসেবে বিনয় উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু বিনয়-সম্পর্কিত একাধারে অনুভবী, মননশীল ও বিশ্লেষণী একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখে কবি জ্যোতির্ময় দত্ত খেয়ালী কবিকে রাতারাতি লাইমলাইটে নিয়ে আসেন। সে প্রসঙ্গে আসছি। শক্তি ছিলেন বিনয় ও 'কৃত্তিবাস'-এর মধ্যবর্তী মাধ্যম। শক্তি হাংরিমন হয়ে 'কৃত্তিবাস'-এর সাময়িক সম্পর্ক ছিন্ন করলে বিনয়ের পক্ষেও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা আর হয়ে ওঠেনি।

পত্রিকাগুলির সম্পাদকমহলে বিনয় এতদিনে বেশ পরিচিত নাম হয়ে পড়েছেন। 'অমৃত' পত্রিকার কমল চৌধুরী, 'দেশ' পত্রিকার সাগরময় ঘোষ প্রমুখ কবিতার অনুরোধ জানালেন কবিকে। বিভিন্ন কবি-সম্মেলনে যাওয়ার নিমন্ত্রণ আসতে লাগলো। এমনকি, ইউসিস্-এ আয়োজিত আমেরিকানদের এক সাহিত্য সম্মেলনেও বিনয় সে-দিন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কোলকাতার অধিকাংশ তরুণ কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিনয়ের। উৎপল বসুর সঙ্গে আলাপ, উৎপল মারফত তারাপদ রায়— এইভাবে...। তারাপদ রায়ের বাড়িতে সন্ধেবেলা তরুণ কবিদের রোজকার আড্ডা বসতো। এই সান্ধ্য আসরেই সম্ভবত শংকর চট্টোপাধ্যায়, সুধেন্দু মল্লিকদের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ জমে ওঠে। তারাপদ রায়ের বাড়িতে অবলীলায় শুয়ে মাঝেমধ্যেই বিনয় রাত কাবার করছেন। বাবার কাছ থেকে মাস-পয়লায় পাওয়া একশোটি টাকা সম্বল করেই তৎক্ষণাৎ গ্রাম থেকে কোলকাতায় পাড়ি দেওয়া বিনয়ের দিনযাপন ছিলো এ'রকমই। চালচুলোহীন সময়পর্যায়েই বিনয় প্রায় নিজেরই উদ্যোগে প্রকাশ করছেন 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি; অল্প ক'দিনের ভিতরে তিন-তিনটি সংস্করণও। বন্ধু অমিতাভ বসু বইটি প্রকাশনার ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। 'ফিরে এসো, চাকা'-র কবির 'ঈশ্বরীর' কাব্যটি সঙ্গত কারণেই আদৃত হলো না। তবে এর পর বিনয়ের নিজ-খরচে বই প্রকাশের দিন ফুরলো। কিছু মিথ, প্রকল্পিত মিথ্যেয় মিথোজীবিতায় জড়ালেন তিনি। তারাপদ রায়ের কল্যাণে বিনয় মজুমদারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পূর্বে জ্যোতির্ময় দত্ত নিছক বিনয়পাঠে মুগ্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ' নামক একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধ পড়ে সন্তোষচিত্ত বিনয় জ্যোতির্ময় দত্তের অনুরোধে তাঁকে একটি হলফনামা লিখে দিয়েছিলেন। তাতে "এই প্রবন্ধে ব্যক্ত কোনো মন্তব্য, প্রদত্ত কোনো তথ্য, লিখিত কোনো উক্তি— আমার নিকট কিছুমাত্রও আপত্তিকর বলে মনে হয় না।"[১৫২] লেখা ছিলো। অতঃপর 'কৃত্তিবাস'-এর বিংশ সংখ্যায় জ্যোতির্ময় লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশ্যে আসে। ২১.৩.৬৪ তারিখে এই 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট'টি বিনয় লিখে দিয়েছিলেন।[১৫৩] সম্ভবত, শক্তির 'গায়ত্রীকে' সমালোচনাটি নিয়ে বিনয়ের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে জ্যোতির্ময় দত্ত জ্ঞাত ছিলেন, আর সে-কারণেই ঝুঁকি নিতে চাননি। বিনয়বীক্ষায় জ্যোতির্ময়ের প্রবন্ধটির গুরুত্ব অশেষ। নির্বাচিত খণ্ডাংশ : "এই প্রবন্ধের নায়ক একজন কবি যিনি সম্ভবত এখনো জীবিত। হয়তো এই মুহূর্তে কলকাতার বাইরে বাস করছেন, কিন্তু যাঁর জীবন ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দশ শতকের কোনো কবির মতোই রহস্যাবৃত। বিনয় মজুমদারেরে জন্মের তারিখ কী? কোন গ্রামে তাঁর জন্ম? কোথায়, কীভাবে তাঁর শৈশব কেটেছে? তাঁর পরিচিত অনেক ব্যক্তিকে অক্লান্তভাবে জেরা করে যেটুকু জেনেছি তা অল্পই, এবং তারও অধিকাংশই কল্পনামিশ্রিত। এরই মধ্যে বিনয় মজুমদার বিষয়ে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত হয়ে গেছে, এবং তার মধ্যে সত্যের অংশ কতটুকু তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব

নয়। তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট শুধু এইটুকু : বিনয় মজুমদার একজন বেদনার্ত, সত্যদ্রষ্টা কবি, একজন শহিদ, যিনি নিজের সবটুকু কবিতায় নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন, এবং যাঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি, বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।...

"...বিনয় মজুমদার নামক ব্যক্তিটি সশরীরে কলকাতায় বর্তমান, কিন্তু কবিটির ১৯৬২ সালে মৃত্যু হয়েছে।"[১৫৪] শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের করা 'ফিরে এসো, চাকা'-র রিভিউটিই জ্যোতির্ময়কে বিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো বলে শোনা যায়। কোনও এক বিকেলে, পেয়াদাদের বাধা হঠিয়ে, মলিন গিঁট দেওয়া পাৎলুন ও ঢোলা, ছেঁড়া জামায় জ্যোতির্ময় দত্তের সামনে মূর্তিমান বিস্ময় বিনয় হাজির হন। সেই আবির্ভাবের বর্ণনা জ্যোতির্ময় দিয়েছেন— "এই নেটিভ সমুদ্রে তখনও স্টেটসম্যান এক সাজানো-গোছানো শ্বেতাঙ্গ দ্বীপ। তার মধ্যে তো বটেই, কিন্তু এই ধুলোর কলকাতার পথেও, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই, ওই মূর্তি বেমানান। কাপড়জামা পাগলের কি ভিখিরির, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেবদূতের।...

"তথাকথিত মানসিক বৈকল্যের মেঘ বিনয়ের মাউন্ট পালোমার-এর দূরবীনের চেয়েও ক্ষমতাশালী চৈতন্যের আয়নাকে অধিকাংশ সময় ঝাপসা করে রাখে। সেই মেঘ চিরে এক ফালি আলো ওই বিকেলে হেসেছিল।"[১৫৫]

প্রবন্ধের অধিক পাহারা ও প্রশ্রয়ে জ্যোতির্ময় ছুঁলেন বিনয়কে। ত্রিশের সুখ্যাত 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু এভাবেই মস্তিষ্কবিভ্রাটের শিকার বন্ধুস্থানীয় কবি হেমচন্দ্র বাগচী-র জন্য 'কবিতা' ও 'কবিতা ভবন' উভয় দ্বারই অবারিত করেছিলেন। একজন প্রকৃত কবির কবিমনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আরেক কবি জ্যোতির্ময় নির্ভার বহন করলেন।

জ্যোতির্ময়-মীনাক্ষীর ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে বিনয়ের আসা-যাওয়া আরও অবাধ হলো পত্রিকা দপ্তরে জ্যোতি-বিনয়ের মধ্যরাত্রের সাক্ষাতের পর থেকে। প্রথমে দিন, পরে সন্ধে হয়ে রাত গড়িয়ে যেতে থাকলো। প্রথম দফার মানসিক চিকিৎসার রেশ তখনও চলছে, বিনয়কে বেশ সুস্থই বলা চলে। কিন্তু কিছুদিন পর পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি বিনয়কে ফের খেলার মাঠে টেনে নামায়। অনিয়ন্ত্রিত মানসিকতার নৈরাজ্যে নৈরাশ্যে বিনয়ের পুরনো ব্যাধি নখদাঁত বিস্তার করে। নইলে ভালো থাকলে বিনয় মিলেমিশেই থাকেন, তাস খেলতেন, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে দাবা। ব্রিজ খেলার হাত চিরকালই অসাধারণ বিনয়ের।[১৫৬] তাস-দাবা খেলায় তাঁর দক্ষতা খুব সম্ভব হিন্দু হস্টেলজীবনের দান। বিনয় সুস্থ থাকলে মীনাক্ষীর দেওর তিমিরকে কলেজের পড়াও দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু কবির অসুস্থ দশাটি মারাত্মক। সে হিংস্রতার প্রকাশও একমুখী

নয়। গৃহকর্ত্রী মীনাক্ষীর পক্ষে এবার বিনয়কে মেনে নেওয়া একটু অসম্ভবই ঠেকছে।[১৫৭] বিনয়ের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনও রকম সদুত্তর নাকি সে-তরফে পাওয়া যায়নি। মানসিক স্বাস্থ্যের টানাপোড়েনের হেতু বিনয় তখন মাঝেসাঝেই কোনও না কোনও মেয়েকে 'ঈশ্বরী' বানিয়ে নিতেন।[১৫৮] কবিতা লেখার মতো মানসিক সৌকর্য অস্তমিত হয়ে আসছে তাঁর। স্নান-খাওয়া ভুলে সারাক্ষণ স্বরচিত ঘোরের মধ্যে থাকতে থাকতে শব্দের পর শব্দ সাজাচ্ছেন স্রেফ প্রবৃত্তির বশে। যা লিখছেন, যা আঁকছেন, তিনি তাতেই তৃপ্ত। যে কবি কবিত্ব ও কবিতা নিয়ে দুর্বার প্যাশন ও স্ট্যামিনা থেকে একসময় বলতে পেরেছিলেন— "...আমি সারাজীবন চেষ্টা করেছি যাতে বাঙালী কবিরা আমার কবিতা নকল করে। কবিতার সমালোচক গন [সমালোচকগণ] বিশেষত পাঠকগণ বিচার করুন আমি কতটা সার্থক হয়েছি। বিদেশী কবিতা নকল করার ভয়ে আমি ১৯৫৯ সালের পর আর কোন বিদেশী কবিতা পড়িনি। শুধুমাত্র বাংলা কবিতা পড়েছি।..."[১৫৯]; সেই তিনিই সার্থক কবিতার বদলে কিছু শৈলীসর্বস্ব শব্দসম্ভার গেঁথে চললেন।

'ঈশ্বরীর' কবিতাগুলি লিখে ওঠবার পর অনেক দিন বিনয় কবিতা লেখেননি। তারপর জ্যোতির্ময়-মীনাক্ষী-র বাড়িতে বাসকালে বিনীত প্রকাশ 'আমার ইশ্বরীকে'। 'কৃত্তিবাস'-এর পরবর্তী এক সংকলন-সংখ্যায় কবি বিনয় মজুমদারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হলো— "বাংলাদেশে ইনিই সম্ভবত একমাত্র কবি যিনি নিজের ইচ্ছেমতো জীবন কাটাচ্ছেন। ওঁর ১৪৩টি কবিতা, সমগ্র কবিতা-সংগ্রহ হিসেবে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' এই নামে সুদৃশ্য বাঁশপাতা কাগজে ছাপা, শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।"[১৬০]

দত্ত পরিবারের আর্থিক বদান্যতায় 'আমার ঈশ্বরীকে' ছাপা হয়। "বিনয় একটি চটি বই বার করেছিল নীল তুলোট কাগজের মলাট দিয়ে, আমাদের বাড়িতে থাকার সময়। তার কপিরাইট আমাকে দিয়েছিল"[১৬১] বলতে অবধারিত 'আমার ঈশ্বরীকে'-র কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। মীনাক্ষী যোগ করছেন— "তার কপিরাইট আমাকে দিয়েছিল। মাত্রই কয়েক কপি বাঁধাই হয়ে এসেছিল বাড়িতে বোধহয়। কয়েকদিন পরেই দেখলাম ওই অমূল্য পুস্তকখানির সর্বসত্ত্ব আর আমার নেই।"[১৬২] 'আমার ঈশ্বরীকে'-র সঙ্গে 'ঈশ্বরীর' কবিতাগুলি ও আরও কয়েকটি কবিতা জুড়ে 'গ্রন্থজগৎ'-এর দেবকুমার বসুর প্রকাশন-সহায়তায় বিনয় ততদিনে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-কে পাঠকসমক্ষে এনে ফেলেছেন, মাস দেড়েক পর ১৯৬৫-র ১৭ সেপ্টেম্বর 'অধিকন্তু' কবিতাপুস্তিকাটিও। কিন্তু তখনের বিনয়ের সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন মীনাক্ষী দত্ত। বিনয়ের মনোগহনে জাত ও জায়মান নারীঘটিত বিকার বহুমাত্রিকতা ধরছে কীভাবে দেখবো— "...ওই সময়ে ওর কবিতার খাতাগুলি আমাকে দিয়েছিল। আমার

জাগতিক জিনিসের প্রতি অতি অমনোযোগ সত্ত্বেও তার দু-একটি এখনো আমার কাছে রয়ে গেছে। সিল্ক বা তসর দিয়ে তৈরি ব্লাউজ সহজে ফেঁসে যায়। সেই ব্লাউজ দিয়ে বিনয় বেশ কায়দা ক'রে খাতা বাঁধিয়েছিল। বিনয়ের যে দুটি খাতা আমার কাছে এখনো আছে তা আমার ব্লাউজের টুকরো দিয়েই বাঁধানো।"[১৬৩] মেয়েদের ব্লাউজের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর কিছু দিয়ে নিজের কবিতার খাতার সজ্জাকে যৌনবিজ্ঞানের ভাষায় 'বস্তুকাম' বলা যেতে পারে কি? বিনয়ের যৌন মনস্তত্ত্ব বেদিশা হয়ে পড়ছে এখন থেকে, কবিসুলভ খ্যাপাটেমি বিকৃতির দিকে এগোচ্ছে।

'উত্তরঙ্গ' পত্রিকার সম্পাদক বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে 'অধিকন্তু'-র প্রথম কবিতাটি লিখেছিলেন বিনয়। কবিতাগুলি লেখার সময় কবি বিনয় কেমন মানসিক অবস্থার মধ্যে নিজেকে অতিবাহন করছিলেন , বিনয়ের একটি লেখা থেকেই তা আমরা জেনে নেবো— "এর কোনো তুলনা হয় না, এত বিশ্বজনীন। অবশ্য এখন মনে হয়, যে-কোনো বই লেখার সময়েই কবি এই রকম ভাবে। এবং এইরকম ভাবে ব'লেই লিখে শেষ করতে পারে।"[১৬৪] 'অধিকন্তু'-র প্রথম দশটা কবিতা বিনয় 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' থেকেই নিয়েছিলেন। দশম কবিতাটির নিচে তারিখের উল্লেখ ছিলো ৪.৫.১৯৬৫। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-কেই স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা গোছের একটি সংকলন হিসেবে বিনয় তখন ভেবে থাকতে পারেন। কেননা, বিনয়ের প্রকাশিত প্রথম কবিতার বই 'নক্ষত্রের আলোয়' থেকেও নির্বাচিত সাতটি কবিতা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'-তে স্থান পেয়েছিলো। 'নক্ষত্রের আলোয়'-এর ৭টি এবং 'অধিকন্তু'-র ১০টি কবিতার সন-তারিখের বিবরণ কিন্তু 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' ও 'অধিকন্তু' পর্যায় শেষ হওয়ার পর বিনয় মজুমদারের 'ঈশ্বরী' বিষয়ক কবিতাবলির ছরবেছর গ্রন্থনামের পরিবর্তন, কবিতা-নির্বাচন, কাঁচিচালন, সমস্যায়িত মুদ্রণ ইত্যাদির জটিলতা শেষ হয়। মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে জ্যোতির্ময় দত্ত পাবলিকেশন শুরু করলে 'ফিরে এসো, চাকা তার পূর্বনাম ও শরীর ফিরে পেলো। দু-একটি সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া পূর্বোক্ত সংস্করণের হুবহু পাঠ এই 'কলকাতা' সংস্করণটিতে অনুসরণ করা হলো। একটি কথা এ-প্রসঙ্গে বলতেই হবে, যে দশকের সূচনায় বিনয় বিড়ম্বিত ভাগ্য, সেই দশকের অন্তিমেই তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন কবিখ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে। 'ফিরে এসো, চাকা'-র কবি বিনয় তাঁর প্রতিভায়, প্রক্ষেপে, প্রলাপে তখন কলেজস্ট্রিট চত্বরে একটি উচ্চারণযোগ্য অবশ্যনাম। কিন্তু মনোবিকলন তাঁর চিরস্থায়ী আঁধিব্যাধি হয়ে বসছে। অ্যালবাম ঘেঁটে মীনাক্ষী তুলেছেন তার টুকরোটাকরা— "...আবার বিনয়কে দেখা গেল আমাদের সংসারে। তখন আমরা বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মুখে একটা ছোট্ট বাড়ি নিয়েছি। রাস্তাটায় কয়েকটা মাত্র বাড়ি এবং একদিকের মুখ বন্ধ বলে সবাই সবাইকে খুব চিনতো। ওইখানে আমাদের বাড়ির উল্টোদিকের গৃহবধূকে 'ঈশ্বরী'র রোলে মানাবে ব'লে

বিনয় স্থির করলো। এর ফলে বাড়ি ছেড়ে পালানোর অবস্থা এলো আমাদের।”[১৬৫]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল ‘স্টেট্‌সম্যান’ পত্রিকার ‘ক্যালকাটা নোটবুক’ বিভাগে ‘POET’S CORNER’ শিরোনামে বিনয়কে নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো।[১৬৬] এর কাছাকাছি সময়েই হিন্দি ভাষার সর্বভারতীয় কবিমহলেও বিনয় পরিচিত হচ্ছেন। বিনয় তাঁর আত্মগত একটি আলাপে জানিয়েছেন— “এই সময় একটি হিন্দী পত্রিকায় হিন্দী অনিবাদ প্রকাশিত হয়। কবি পরিচিতিতে লিখেছিলো যে আমি বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি। পত্রিকাটির নাম এখন আর মনে নেই। ‘মরাল’ নামে হিন্দী পত্রিকাটি বোধ হয় নয়। অন্য কোনো পত্রিকা হবে। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ তরুণ বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়ে যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেক বিদেশী ব্যক্তির সঙ্গেও আলাপ হয়। বিখ্যাত বঙ্গভাষা প্রেমিক আমেরিকান অধ্যাপক ডিমক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা হতো।”[১৬৭]

বিনয়ের কবিতাচর্চায় কখনও জোয়ার, কখনও ভাটা— কোনও সুসমঞ্জস গতিবেগে কবিতাগুলি উৎসারিত হয়নি। কবিতা রচনা তিনি করেন না, কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নেয়; জ্যোতির্ময় দত্তের মতটিই মনে হয় সঠিক।[১৬৮] ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে দমদম ক্যান্টনমেন্টের গোরাবাজারে এক সম্পর্কিত বোনের বাড়িতে থাকার সময় মাত্র মাসখানেকের ভিতরেই তিনি ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’ লিখেছিলেন। শহরতলির বাগানবাড়ি, গাছ, লতা-পাতা, পাখি, পুকুর ইত্যাদির ঘেরাটোপে বিনয় এই প্রথম প্রকৃতিবর্ণনামূলক কবিতা লেখার ভাবলেন। বলছেন— “এ-অবধি আমি কোনোদিন নিসর্গবর্ণনামূলক কবিতা লিখিনি। অধিকাংশই ঘটনার বিবৃতি লিখেছি।”[১৬৯] দীর্ঘ সাতটি কবিতা লিখলেন। পরে প্রথম দুটি কবিতা একসঙ্গে জুড়ে দিলে কবিতার সংখ্যা একটি কমে দাঁড়াল ছয়। কবিতাগুলি ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত হলো। হেমন্ত ঋতুর অগ্রহায়ণ মাসে লিখে উঠলেন বলে কবিতামালাটির নাম দিলেন ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’। কবির কথায়— “কবিতাগুলি পড়লে যেন পাঠকের মনে একটা হেমন্তের অনুভব জাগে এই ছিল উদ্দেশ্য— সে চৈত্র মাসে বসে পড়লেও যেন জাগে, কি বৈশাখ মাসে বসে পড়লেও।”[১৭০]

অন্য একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় বলেছেন— “জন্ম, মৃত্যু, চিন্তা— জন্ম কী, মৃত্যু কী, চিন্তা কী, পরলোক কী, পূর্বজন্ম আছে কিনা, এই সব চিন্তা খুব— মনে এসেছিল...তাই লিখেছিলাম... ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’।”[১৭১]

বিনয় তখন গোরাবাজারে, সাহিত্যিক-সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর ‘কবিতা-পরিচয়’ পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখে দেবার অনুরোধ নিয়ে তাঁর কাছে আসেন। জীবনানন্দের

‘বনলতা সেন’ কবিতাটি নিয়ে বিনয়কে দিয়ে লেখানোর পরিকল্পনা অমরেন্দ্রবাবুর ছিলো, কিন্তু বিনয়কে যে জীবনানন্দেরই ‘অদ্ভুত আঁধার এক’ কবিতাটি বেশি টানে! বিনয়ের এই লেখাটি ‘কবিতা-পরিচয়’-এর সপ্তম সংকলনে (কার্তিক, ১৩৭৩) প্রকাশিত হয়। এরপরও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লাগাতার তাগাদায় বিনয়কে লিখতে হলো ‘কাব্যরস’ ও ‘অবয়ব ও অনুভূতি’ নামে দুটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধদু’টিতে আলোচিত কাব্যতত্ত্বনির্ভর একটি কাব্যগ্রন্থ লিখবেন বলে ভাবলেন তিনি এবং নারীভূমিকাবর্জিত একটি বই লেখবার কথাও প্রথম তাঁর মনে হলো। ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’-র কবিতাগুলি এইভাবে লিখিত। বিনয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্বসংসারে তাঁর একাকিত্বের কথাই কবিতাগুলির পরণভোমরা।[১৭২]

‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’-র পর্যায়ে লেখা ‘কাব্যরস’ এবং ‘অবয়ব ও অনুভূতি’-কে একত্র করে ‘ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ’ নামে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ‘কবিতা-পরিচয়’-য়ে ছাপানোর জন্য বিনয় দিয়েছিলেন। কিন্তু, ততদিনে ‘কবিতা-পরিচয়’ বন্ধ হয়ে গেছে। ‘ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ’ পরে জ্যোতির্ময় দত্ত স্বসম্পাদিত ‘কলকাতা’ পত্রিকার দু’টি সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

নিবন্ধটি ঈশ্বরীর স্বরচিত কেন সে প্রশ্ন উঠবে। বিনয়-সংকলক শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে বিনয় তার নিরসন করবার চেষ্টা করেছেন। এই বইটির আকার দেবার সময় বিনয়ের মর্মভূমে এই বিশ্বাসই প্রোথিত ছিলো যে, তিনি ইশ্বরীর স্বামী। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরীই তাঁর চিন্তনজগতে তত্ত্বের জোগানদার, তিনি লিপিকার মাত্র।[১৭৩] অর্থাৎ, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বব্যাখ্যায় চৈতন্যদেবের মতোই যেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীর অবস্থান। তাই তাঁর কোনও লেখা (লিখন!) ঈশ্বরীর স্বরচিত হতে সমস্যা থাকার কথা নয়।

যাই হোক, ‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’-র ছ’টি কবিতার মধ্যে কোনওটি গৌরাঙ্গ ভৌমিক-এর ‘অনুভব’ পত্রিকায়, কোনওটি নির্মাল্য আচার্য-র ‘এক্ষণ’ পত্রিকায় ছাপা হলো। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘কৃত্তিবাস’-এ দু’টি কবিতা ও বিমল রায়চৌধুরী সম্পাদিত ‘দৈনিক কবিতা’-য় প্রকাশ পেলো একটি কবিতা। ৩ নং কবিতাটি জ্যোতির্ময় দত্ত ‘কলকাতা’ পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে। কবিতাগুলি প্রশংশিত হলে পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন তিনি বইটা ছেপে বের করবেন, সঙ্গের অলংকরণও করে দেবেন তিনিই। বই হয়ে বেরনোর আগেই সমালোচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্ত।[১৭৪] কিন্তু সকলেই তো আর জ্যোতির্ময় দত্ত নন যে , এই প্রতিভাবান উন্মাদকে শাদা বাড়ির অতন্দ্র প্রহরীর মতো ছায়া, মায়া, মুথাঘাসের শপথে মুড়ে রাখবেন! বাস্তব তো সাধারণত কথা না-রাখারই।

‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’ ছাপাতে কোনও প্রকাশককে রাজি করাতে না পেরে বিফল মনোরথ কবি ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’-এ হাজির হয়ে পাণ্ডুলিপিটি কেবল জমা রাখার অনুরোধ

জানিয়েছিলেন। সমর্থ হলেন না বিনয়। ভবানী দত্ত লেনে অবস্থিত 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার'-ও কবির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে সম্মত হলো না। পাণ্ডুলিপির প্রতি প্রবল মমত্ব ও চৌপার্শ্বের প্রতি পুঞ্জীভূত অভিমানে আক্রান্ত বিনয় সেটিকে জাহাজের ডাকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরিতে পাঠিয়ে দিলেন। উক্তনাম গ্রন্থাগারে কবি বিনয় এই প্রথম জায়গা নিচ্ছেন। গণিতজ্ঞ বিনয় তাঁর গাণিতিক আবিষ্কার 'Interpolation' সিরিজের গবেষণাপত্রটি আগেই ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে প্রেরণ করেছিলেন। নিছক পত্রানুরোধেই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁর থিসিস প্রিসার্ভ করেছিলো। শুধু তাই নয়, পরে একবার বিনয় তাঁর কাছে কোনও কপি নেই বলে জানালে পুরো পাণ্ডুলিপিখানার ফটোকপি করে পাঠিয়েও দিয়েছিলো। সেই প্রতিলিপিটি বিনয় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে জমা দেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে 'রয়্যাল সোসাইটি অফ লন্ডন'-এও নাকি বিনয় একটি থিসিস পাঠিয়েছিলেন। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র খসড়াখাতাটি ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরির বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত রয়েছে, এ-তথ্য বিনয়েরই দেওয়া।[১৭৫]

এই যে বারবার করে ব্রিটিশদের দ্বারস্থ হওয়া, এর পেছনে আসলেই বিনয়ের একাকিত্ব, অনিরাপত্তার বোধ কাজ করেছে। যাপনের ব্যর্থতা কুরে-কুরে খাচ্ছে তাঁকে। করতে চাইছেন কিন্তু পারছেন না, প্রতিভার আগুন জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে খালি স্থিতাবস্থার অভাবে, মহাগ্রন্থ লিখতে চেয়েও শেষ অবধি লিখে উঠলেন 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা', তাও গ্রন্থরূপ দেওয়া গেলো না তখনই। বুঝতে শিখছেন, শুধু কবিতা করে, শুধু প্রশংসায় ভিজে আর যাই হোক এ-দেশে দিনাতিপাত করা চলে না। বন্ধুরা যে যার মতো প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকে সরে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু কবি বিনয় আর ব্যক্তি বিনয় যে অভিন্ন! অভিমান সফেন হয়ে মোচড় দিচ্ছে বুকে।... এ বইয়ের সমালোচনা লিখলো না কেউ। হতাশ্বাস কবির কবিতা লেখার হার কমে এলো উদ্বেগজনকভাবে। তিনি নিজেই পরিসংখ্যান দিচ্ছেন যে, "১৯৬৭, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ এই তিন বছরে আমি গোটা পঁচিশেক কবিতা লিখেছি। তাও আবার খুব ছোট আকারের।"[১৭৬]

অভিযোগে সরব না হয়ে অভিমানে নীরব হলেন কবি। সময় থেকে, সমর থেকে, সমাজ থেকে, স্বজন থেকে ক্রমবিকর্ষিত বিনয় তাঁর স্বভূমি কবিতার পান্থপথেও তখন দিগ্‌ভ্রান্ত। ১৯৬৬-র যে বছর মাও সে-তুং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিলেন, সেই বছরই ভারতবর্ষ খাদ্য আন্দোলনে ফেটে পড়লো, দেশে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ ছুঁলো এবং বিনয় মজুমদার 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' লিখলেন। তাঁর কবিবন্ধুরা জীবনে যেটা করছেন না, করতে চাইছেন না বা করে উঠতে পারছেন না, বদলে তা-ই করে দেখাচ্ছেন কবিতায়। কিন্তু বিনয়, যাপনের অসম্ভব কৃচ্ছে থেকেও কবিতার কল্পিত প্রেয়সীতে রইলেন অবলীন। যেহেতু কবি বিনয়ের চেয়ে ব্যক্তি বিনয় কোনও অংশেই বেশি আলোচ্য হতে পারেন না, সে-কারণে সময় ও বিনয়ের

মধ্যের ব্যস্ত-সম্পর্কটিই সতত সমালোচনায় প্রতিপন্ন হয়েছে। '৬৭-তে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট আমল সূচিত হলো, বিশ্ব-রাজনীতিতে ইন্দ্রপতন— মৃত্যু হলো আর্জেন্তিনীয় সন্তান কিউবা-বিপ্লবের রূপকার বিপ্লবী চে গেভারা-র,... স্মরণে সুনীল লিখলেন— "চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—/ আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, আমার অনবরত/ দেরি হয়ে যাচ্ছে/ আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো আলো/— ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,/ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে/ চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!"[১৭৭]; আরও অনেকেই অনেক কিছু লিখলেন, বললেন, বাঁধলেন; আর শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়তই অসুস্থ বিনয় পাসপোর্ট ছাড়াই পেট্রাপোল সীমান্ত পেরিয়ে পায়ে হেঁটে চলে গেলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে।...

'অঘ্রান' পর্বেই শরীরগত দিক থেকে ভঙ্গুরতার ধারকিনারে এসে দাঁড়িয়েছেন বিনয়। সেই অনুভূতির ধারাবাহিকী পুস্তকাকার ধরলো অনেক পরে **১৯৭৩**-'৭৪, শ্রাবণ **১৩৮১** বঙ্গাব্দে। পশ্চিম থেকে সদ্য ফিরে আসা জ্যোতির্ময় দত্তের 'কলকাতা' প্রকাশনী থেকে বছর তিন-চারেক আগে 'ফিরে এসো, চাকা' বেরিয়ে গেছে। বিলেতপ্রবাসে থেকে কেবল টাকা পাঠিয়েই শুষ্ক দায়িত্ব সারেননি জ্যোতির্ময়, নিজের প্রকাশনী সংস্থার তরফে প্রথম বইটি বিনয়েরই কবিতার বই প্রকাশ করে বন্ধুকৃত্য সেরেছেন।[১৭৮] আমেরিকার 'হাডসন রিভিউ' পত্রিকা জ্যোতির্ময় দত্তের কাছে তাঁর নিজের কবিতার অনুবাদ প্রার্থনা করলে জ্যোতি বলেছিলেন— "না আমি অন্য একজনের করবো। আমাদের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ কবি।"[১৭৯] অনুবাদক বিনয় কবি বিনয় হয়ে ওঠার পর এই প্রথম তিনি নিজে অনুদিত হলেন। 'হাডসন রিভিউ'-র পাশাপাশি 'ট্রাইকোয়ার্টলি' জাতীয় গুটিকয়েক কাগজেও জ্যোতির্ময়কৃত বিনয়ের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। আমেরিকা থেকে ফেরার পর বন্ধু বিনয়কে পত্রিকাগুলির কপি দেখিয়েওছিলেন জ্যোতির্ময়। তর্জমায়িত কবিতাগুলির সঙ্গে বিনয়ের ছোট একটি জীবনীও পত্রিকার পাতায় ছিলো। সেখানে কবির বর্তমান অবস্থা জানানো হয়— "বিনয়ের মর মর দশা।"[১৮০] সত্যিই বিনয় তখন অসুখে, দৈন্যে সঙিন। ষাটের দশকের শেষে বিনয়ের মনোরাজ্য মোটামুটি তছ্নছ্ হয়ে আছে। একাধিকবার হাজত, উন্মাদাশ্রম তাঁর ঠিকানা হয় সেই সময়।[১৮১]

মানসিক অসুস্থতার ওষুধ, অনিচ্ছের অস্বস্তির ইঞ্জেকশনের হাত থেকে বাঁচতে জনরোল মাড়িয়ে বিনয় বিজনতায় পালাচ্ছেন, রাজনৈতিক বেড়ায় পদচিহ্ন এঁকে পৌঁছে যাচ্ছেন শিকড়পুর ফরিদপুরে। এক মুসলমান পরিবারে আশ্রিত হচ্ছেন কবি। যে সময়ের কথা, তার ঠিক দু'বছর আগেই **১৯৬৫**-তে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু ও শেষ হয়। কিন্তু, প্রতিটি বিস্ফোরণের পর কিছু চপ্পল পড়ে থাকে! স্মৃতিও তেমনই কিছু হবে। এমন রাজনীতিগত উষ্মার ভিতরেই বিনয়ের জাল ছেঁড়া; পুনরায় দেশে ফেরা খুব সহজ হয়নি কিন্তু। তবে স্বেচ্ছাধীন বিনয় সেখানে মন্দ ছিলেন বলে মনে হয় না। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন— "ভোরবেলা একজনকে

ইংরেজি পড়াতাম, দুপুরবেলায় শেখাতাম অঙ্ক। আর রাত্রিবেলা চার-পাঁচ জনকে পড়াতাম— ক-খ-গ-ঘ থেকে শুরু করে ক্লাস নাইনের পড়া পর্যন্ত। বাকি সময়টা আড্ডা মেরে বেড়াতাম।''[১৮২] পৈতৃক গ্রামের সমবয়স্ক মুসলমান বন্ধুরা যতনে রেখেছিলো তাঁকে। তারপর স্বেচ্ছায় থানায় আত্মসমর্পণ করেন সে-দেশের নাগরিকত্ব লাভের প্রার্থনা নিয়ে। সে-দেশ বলতে তাঁর আজন্মের জন্মভূমি। পূর্ববঙ্গে যে গ্রামে তিনি জন্মেছেন, সেখানে সম্ভব হলে মুসলমান হয়েও থেকে যেতে রাজি ছিলেন বিনয়। এই তো সেই কবিজন, খালি গায়ের গামছা— 'মা' এবং কবিতার নির্ভেজাল স্বর্গের জন্য তথাকথিত সভ্যতার বর্ম : ধর্ম ও কাঁটাতারের নিকুচি করেন— ''নিষিদ্ধ ফল বলে কিছু নেই, নিষিদ্ধ দেশ/ কবিরাই পারে ভেঙে দিতে তত্ত্ববীজ/ রাজনীতির নকল নির্দেশ।'' (সূত্র : স্বপন সেনগুপ্ত, 'ভাঙো তত্ত্ববীজ', ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী, সৈকত প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ— বইমেলা ২০০১, আগরতলা-৭৯৯০০৭, পৃ. ২৭) তাঁকে গুপ্তচর সন্দেহ করে রাজধানী ঢাকা থেকে গোয়েন্দা আনানো হয়। সীমান্ত অগ্রাহ্যের খেসারত হিসেবে বিচারাধীন বন্দিরূপে কারাবাস হয় তাঁর। বিনয়ের কবি-পরিচয়ে সংশয় প্রকাশ করে বলা হয়েছিলো— ''কবিতা লেখেন নাকি? কাগজ দিচ্ছি, লিখুন দেখি কী কবিতা লেখেন।''[১৮৩] নানান কৌণিক দূরত্ব থেকে সন্দেহভাজন বিনয়ের মুখের ছবিও তোলে পুলিশ-ক্যামেরা। নিরসনে অবশ্য বিনয়কে সীমান্তের এপারে দায়িত্ব নিয়ে পৌঁছেও দেয় তাঁরা। বিনয়ের উপলব্ধি সব মিলিয়ে তিক্ত ছিলো না— ''তবে হ্যাঁ আমাদের হাজতের চেয়ে ওদের হাজত অনেক ভালো। লোকগুলো ভদ্র, খাওয়াদাওয়া ভালো। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার... যত্ন করে বেশ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে দিল— সঙ্গে দুপাশে দুজন এসকর্ট— যারা আমকে সীমান্ত অব্দি পৌঁছে দিয়েছিল মনে আছে।''[১৮৪] জেলে বিনয়ের পাহারায় ছিলেন যিনি, তিনি নাকি নাটক লিখতেন এবং বন্দিকবির কাজ ছিলো সেই লেখার সম্পাদনা। ছোটখাটো একটি স্কুলও তিনি জেলচত্বরে খুলে ফেলেছিলেন ওইক'দিনের মধ্যে। দ্যাশ থেকে দেশে ফিরে এলে বিনয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কৃত্তিবাস অষ্টাবিংশ সংকলনে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিলো— শিরোনাম : 'বিনয় মজুমদার সীমান্ত মানে না।'

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কৃত্তিবাস সংকলন ২৩' (শরৎকাল ১৩৭৩)-এ 'দশটি কবিতা' শিরোনামে বিনয়ের কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিলো আগেই। বিনয়ের স্মৃতিসূত্র থেকে— ''মোটামুটি এই সময়ে আমি লিখলাম 'অধিকন্তু' বইখানি। কারণ 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা লেখার পরে আমি কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আবার সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকেরা আমাকে কবিতা লেখার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। তাদের চাপে প'ড়ে লিখবো কি লিখবো না ভাবছি এমন সময় আমার প্রকাশক দেবকুমার বসু মশায় বললেন, 'তোমার তো টাকার অভাব। দশটি কবিতা লিখে দাও। আমি তোমাকে পাঁচ শ টাকা দেবো।' আমি রাজী

হয়ে গেলাম। এবং দেবকুমার বসু মশায় বললেন পরশুদিন তুমি দশটি কবিতা লিখে কফি হাউসের এই টেবিলেই এসো বেলা অতটায়। আমি টাকা নিয়ে আসবো। ফলে বাড়িতে ফিরে আমি ১৩টি কবিতা লিখলাম। আমি নির্ধারিত দিনে কফি হাউসে গেছি নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে। গিয়ে দেখি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব'সে আছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক। সুনীলবাবু বললেন, 'আপনার কাছে কবিতা আছে?' আমি বললাম যে আছে। সুনীলবাবু বললেন, 'আমাকে সবগুলি দিন, আমি একসঙ্গে ছাপবো।' আমি বললাম, দেবকুমার বসুর জন্য লেখা। সুনীলবাবু শুনলেন না। কবিতা তেরোটি কেড়েই নিলেন আমার কাছ থেকে। দেবকুমার বসু মশায় নির্ধারিত সময়ে এলেন; এসে বললেন, 'এই যে পাঁচ শ টাকা। কবিতা দাও।' ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১৮৫] জন্মগাঁ যাওয়ার আগ অবধি বিভিন্ন ছোটপত্রিকায় নিয়ম করে বিনয়ের কবিতা প্রকাশ পাচ্ছিলো। 'বাল্মীকির কবিতা'-গুলিও টুকটাক বিক্ষিপ্তভাবে পত্র-পত্রিকায় সংকুলান করে। নামকরণ অবশ্যই ঠিক হয়নি তখনও, গ্রন্থববন্ধনের পরিকল্পনাও হবে পরে। দমদমে দিদির বাড়িতে থেকে বিনয় কবিতাগুলি লিখে চলেছেন— " 'অধিকন্তু' বইখানি আসলে ছন্দে লেখা প্রবন্ধ। এর পরেই লিখলাম 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। তারপরে লিখলাম বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি 'টেবিলে রোদের ফোঁটা', 'গমত্ব'— এইসব কবিতা।"[১৮৬] উপরোক্ত কবিতাদু'টি যথাক্রমে কৃষ্ণগোপাল মল্লিক সম্পাদিত 'গল্পকবিতা' এবং নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বাল্মীকি'র কবিতাকারে কবিতাগুলি রূপ পেয়েছিলো 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' প্রকাশের দু'বছর পর, শ্রাবণ ১৩৮৩, (ইং.) ১৯৭৬-এ। অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত এই কাব্যটি সম্পর্কে বিনয় স্বয়ং পরে মন্তব্য করেন— " 'বাল্মীকির কবিতা বইখানির কথা মনে পড়লেই আমি খুব লজ্জা পাই। তার কারণ অত্যন্ত অশ্লীল গোটা কয়েক কবিতা এই বইতে আছে। আমার 'কাব্যসমগ্র' ২য় খণ্ডে এই অশ্লীল কবিতাগুলি বাদ দিতে বলেছি সম্পাদককে।"[১৮৭]

বিনয়ের স্বগত, স্বজনগত, সুহৃদ্‌গত, শরীরগত বিচ্ছিন্নতাই আসলে যৌনতাবিষয়ক এই বিকৃতির চেহারা নিয়েছে। জননী, রমণী প্রভৃতির প্রতি অবদমিত আসক্তি তাঁর জীবন ও কবিতার শিল্পিত ক্যানভাসে এর পর থেকে ক্রমশই স্থূল দাগ ফেলে গেছে। বিনয়ের ঘনিষ্ঠজনদের অনেকেরই মতে চিকিৎসার পরিভাষায় তাঁর অসুখটার নাম 'স্কিৎজোফ্রেনিয়া'। হাংরি মলয়ও তাঁর 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থের ১৬নং পৃষ্ঠায় সমমতের শরিক হয়েছেন। স্কিৎজোফ্রেনিক-রা চৌহদ্দির সকলকেই তার শত্রু বলে মনে করে। পার্থিব কামনাবাসনা, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির শীর্ষাসনা বা অবলোপ ঘটতে থাকে সমানে। যার ঘূর্ণিজাল রোগীকে হিংস্র, উন্মাদ বানিয়ে ছাড়ে। বিনয়ের বিকারগ্রস্ততা কোন খাতে কীভাবে এগলো, সে-সম্পর্কে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা যাচ্ছে— "কিছু আগে আমাদের দেশে ঘুরে গেছেন বিখ্যাত

আমেরিকান দুই কবি, অ্যালেন গিন্‌স বার্গ ও পল মিচেল, তাঁদের কাব্যপ্রভাব ও স্বভাবে যৌনতা আমাদের কবিতায় তখন দগ্‌ দগে যৌনবিকার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।... শোনা যায়, বিনয় মজুমদার কিছুদিন সেই সময় জ্যোতি দত্তের বাড়িতে ছিলেন। হাল্কা ব্লুফিল্‌ম মায়া তাঁকে ঘিরে সারাক্ষণ নেচে বেড়াত। পর্ণোগ্রাফি থেকে উঠে আসা রমণীয় আবেদনে যৌনক্ষুধা জেগে উঠেছিল। তখন কি তিনি কিঞ্চিৎ অধিক মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন?— জানা যায় না। তবে তিনি তখন নিষিদ্ধপল্লীতে ঘোরাফেরা শুরু করেন। জানা যায় তাঁর লিখিত ডায়েরি ও কবিতায়। এইসব মনের মলিন আলো এক ধরনের কবিতার জন্ম দিল। সেগুলোই 'বাল্মীকির কবিতা' নাম নিয়ে 'বিশ্ববাণী' থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশ পায়।"[১৮৮]

'ফিরে এসো, চাকা'-র "...তোমার দেহের কথা ভাবি—/ নির্বিকার কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার, সুখ/ এমন আশ্চর্যভাবে মিশে আছে; পৃথিবীতে বহু/ গান গাওয়া শেষ হলো, সুর শুনে, ব্যথা পেয়ে আজ/ রন্ধনকালীন শব্দ ভালোবেসে, কানে কানে মৃদু/ অর্ধস্ফুট কথা চেয়ে, এসেছি তোমার দ্বারে, চাকা।/ মুগ্ধ মিলনের কালে সজোরে আঘাতে সম্ভাবিত/ ব্যথা থেকে মাংসরাশি, নিতম্বই রক্ষা ক'রে থাকে।" (৭৬ সংখ্যক কবিতা— '২৯ জুন ১৯৬২') কিংবা, "...সার্থক চক্রের/ আশায় শেষের পঙ্‌ক্তি ভেবে ভবে নিদ্রা চ'লে গেছে।/ কেবলি কবোষ্ণ চিন্তা, রস এসে চাপ দিতে থাকে;/ তারা যেন কুসুমের অভ্যন্তরে মধুর ঈর্ষিত/ স্থান চায়, মালিকায় গাঁথা হয়ে ঘ্রাণ নিতে চায়।/ কবিতা সমাপ্ত হতে দাও, নারি, ক্রমে— ক্রমাগত/ ছন্দিত ঘর্ষণে, দ্যাখো, উত্তেজনা শীর্ষলাভ করে, আমাদের চিন্তাপাত, রসপাত ঘটে, শান্তি নামে।/ আড়ালে যেও না যেন, ঘুম পাড়াবার সাধ ক'রে।" (৭৭ সংখ্যক কবিতা— '২৯ জুন ১৯৬২') ইত্যাদি শিল্পিমানসসম্বলিত পঙক্তিগঠন 'বাল্মীকির কবিতা'-য় এসে এলিয়ে পড়েছে। 'বাল্মীকির কবিতা'-র "চাঁদের গুহারদিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে/ দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ, প্রকাশ্য দিনের বেলা, স্পষ্ট দেখা যায়/ চাঁদের গুহার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, ঘাসগুলি ছোটো ক'রে ছাঁটা।/ ঘাসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় গুহার উপরকার ভাঁজ।/ গুহার লুকোনো মুখ থেকে শুরু হয়ে সেই ভাঁজটি এসেছে/ বাহিরে পেটের দিকে।..." (কবিতার খসড়া/ ১৫) বা, "হঠাৎ বেলের দিকে চোখ পড়ে, মুগ্ধ হয়ে যাই।/ বেল দুটি এ বয়সে অল্প পরিমাণে ঝুলে পড়েছে, সে-দুটি/ মনোমুগ্ধকর তবু চোখ ফের নেমে যায় নিচের গ্লাসের দিকে, সেই/ গ্লাসের উপরিভাগ বসার সময়ে যত চওড়া দেখেছি/ এখন এতটা নয়, সরু হয়ে পড়েছে তা, ঘাসগুলি ঘন হয়ে পড়েছে এখন।" ('বসার পরে') প্রভৃতি উচ্চারণ অদ্ব্যর্থক বিকৃত কামনাজাত, এগুলিকে কবিতার তক্‌মা দেওয়া বাতুলতা। 'বাল্মীকির কবিতা'-গুলির নিকটসময়ে রচিত 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-কে 'নারীভূমিকাবর্জিত' ও 'নিসর্গবর্ণনাপ্রধান' করে নির্মাণ করবেন বলেই ভেবেছিলেন বিনয়, তবুও প্রতীকী যৌনতা ('সেতু', 'ক্রিসেনথেমাম ফুল', 'বকুল',

‘মোহনা’, ‘জ্ঞানদণ্ড’ কবিতাভাষ্যে স্ত্রী-পুরুষের যৌনাঙ্গই) কবিতার ভাবে, শব্দে হাসিখেলা করে গেছে। তা যৌনবিলাস, আর এই যৌনবিলাসই ‘বাল্মীকির কবিতা’-য় যৌনবিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসুস্থ কবির কলম একরাশ অসুস্থ কবিতার জন্ম দিয়েছে।

বিনয়ের কবিতার অধোগতিপ্রাপ্তির সময়েই ‘কৃত্তিবাস সংকলন ২৩’ (শরৎকাল ১৩৭৩)-এ জ্যোতির্ময় ঘোষ ‘কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি : তাঁদের কবিতা’ শীর্ষক ধারাবাহিক একটি রচনায় অবশ্য বিনয় সম্পর্কে লিখেছিলেন— “জীবনানন্দের শব্দভাণ্ডার ও সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস কোনো অভিনব রসায়নাগারে জৈবিক প্রথায় মিলিয়ে দিলে বিনয়ের কবিতার কাছাকাছি পৌঁছয়।”[১৮৯]

কিন্তু, ষাটের শুরুর বিনয় আর ষাটের শেষের কিছুতেই বিনয় এক নয়। ষাট শেষ-সত্তর শুরুতে বাংলাভাষার সাহিত্যবিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রেও আলোড়ন এসেছিলো। বেশ কিছু পুরনো পত্রিকা বন্ধ হয় এ-সময়, সমান্তরালে জন্ম নেয় নতুন-নতুন পত্রিকা। বিনয়ের আত্মপরিচয়ে আছে সে-দিনকার ছবি— “ইতিমধ্যে বাংলা কবিতা পত্রিকার রাজ্যে দারুণ ওলটপালট হয়ে গেছে; কৃত্তিবাস, অনুভব, উত্তরঙ্গ প্রভৃতি অনেক ছোটো পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ সকলে দল বেঁধে দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা প্রভৃতি প্রকাশ করতে লেগে গেছে। শক্তি নিজে সাপ্তাহিক কবিতার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছে। ‘সারস্বত’ নামে একটি পত্রিকা দিলীপ গুপ্ত-র সম্পাদনায় বেরিয়ে আবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলো। গল্পকবিতা, কলকাতা প্রভৃতি নূতন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করলে আমাকে এইসব উদ্যমে কেউ ডাকেও নি, আর আমার নিজের যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।”[১৯০] বাক্যগুলিতে বিনয়ের অভিমান প্রকট ইঙ্গিতময় হলেও বিনয়ের স্মৃতিসূত্রের কোথাও কোথাও চিড় ধরেছে বলেই মনে হবে। কেননা, বিনয়কথিত পত্রিকানামের অনেকগুলিতেই বিনয়ের কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠি; তার উপর বিনয়বিষয়ক সমাচার অবধি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিলো। জ্যোতির্ময় দত্তের ‘কলকাতা’ পত্রিকার একটি সংখ্যার প্রচ্ছদও হয়েছে বিনয়ের মুখাবয়বচিত্রিত।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজজীবনের শেষ বছর তথা ১৯৫৭-য় বারাণসী থেকে প্রকাশিত ‘উত্তরা’ পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র নবেন্দু চক্রবর্তী প্রথম পরিচয়ের পরে বিনয়কে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। বিনয়ের অনুল্লেখহেতুই প্রবন্ধটির নাম জানা যায়নি। প্রথম গদ্য-প্রবন্ধ লেখার স্মৃতি বিনয় যা লিখছেন— “প্রবন্ধটি খুব রসিয়ে রসিয়ে রগড় ক’রে ক’রে লেখা। আবার সেই পুরানো কথা মনে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রগড় করা বন্ধ হ্যে গেছে। আর রগড় ক’রে কোনো গদ্য বিশেষ লিখি না। অল্প বয়সে প্রাণ বেশ সরস থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পঞ্চভূত’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে রসিকতা মানেই কোনো ব্যক্তিকে

কিছু আঘাত করা। কথাটা সত্য। পৃথিবীর সমস্ত রসিকতা বিশ্লেষণ করলেই রবীন্দ্রনাথের কথার যথার্থতা ধরা পড়ে।"[১৯১] 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' 'কলকাতা' পত্রিকার দু'টি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন তিনি। দু'টিই যুগ্ম সংখ্যা : চতুর্থ+পঞ্চম, সেপ্টেম্বর+অক্টোবর, ১৯৬৮ এবং একাদশ+দ্বাদশ, ১৩ আগস্ট, ১৯৬৯। এই প্রবন্ধটির সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি চিঠিতে বিনয় জানিয়েছেন— "আমার 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ'তে আমি অনুভূতি বিষয়ে আলোচনা করেছি। অভিজ্ঞতা থেকে টের পেয়েছি যে নিজের মনে অনুভূতি প্রচুর থাকলে তবে তা কবিতা-মাধ্যমে অন্যের মনে সঞ্চারিত করা সম্ভব। যুগে যুগে কবিরা এই ক'রে চলেছি।"[১৯২] 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার 'সংকলন ২২' (মে ১৯৬৬)-এ প্রকাশিত 'এই সব সত্য' নামের একটি ব্যক্তিগত গদ্যে বিনয় তাঁর ঈশ্বরী অনুভবের প্রসঙ্গে বেশ কর্তৃত্ব সহকারেই সত্তার অঙ্গীভবনের কথা বলেছেন। তাঁর কথায়— "কারো সঙ্গে কথা না ব'লে কেবল আপন মনে বাস করা। এমন মানসিক স্বয়ং-সম্পূর্নতা লাভ করা যার ফলে একাকীত্ববোধ আর থাকে না। আমি অবশ্য নিজেই ঈশ্বরীরূপে আমার কানের কাছে চিরকাল কথা বলি এবং মুখ দিয়ে ঈশ্বররূপে তার জবাব দিই। এইভাবে আমাদের বাক্যালাপ চলে। ভালোবাসাবাসি চলে।... এইভাবে চ'লে গেছে কত বছর, যুগের পর যুগ। আরো যাবে অনন্তকাল। তাতে আমাদের কারোই অসুবিধা হয় না। আমি অবশ্য একাই দুজন, এবং দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসি, হাসিকান্না সুখদুঃখের বিষয় আলোচনা করি। দুজন দুজনকে অত্যন্ত বিভোর হয়ে ভালোবাসি।..."[১৯৩]

'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার কথা 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব'-এ বিনয় উল্লেখ করেছেন। পত্রিকাটিতে বিনয় মজুমদারকে নিয়ে লেখা জ্যোতির্ময় দত্তের দু'টি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রথমটি ছিলো পূর্বোল্লিখিত 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ' শীর্ষক রচনাটি থেকে গৃহীত অংশবিশেষ আর দ্বিতীয়টি ছিলো 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রথম কবিতাটির বিশ্লেষণ— 'একটি উজ্জ্বল মাছ : বিনয় মজুমদার'।

আবার এই পত্রিকার পাতাতেই কবিতা-সমালোচক বিনয়ের আবির্ভাব ঘটে। সপ্তম সংকলন (কার্তিক ১৩৭৩)-এ জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটির একটি অন্য ধারার সমালোচনা লেখেন বিনয়। বিতর্কিত এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে নরেশ গুহ একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন। বিনয়ের "...অভিপ্রায় উদ্ভাবনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র"[১৯৪] বলেই তাঁর মনে হয়েছিলো। বিনয়ের কবিতাব্যাখ্যাটি কবিতার সাধারণ স্বাভাবিক ভাবার্থের সঙ্গে যায় না।[১৯৫]

'কবিতা-পরিচয়'-এর সপ্তম সংকলনে দীপ্তি ত্রিপাঠীর কলমে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'নষ্টনীড়'

কবিতাটির একটি ব্যাখ্যাও প্রকাশ পায়। সম্পর্কিত আলোচনায় অংশ নিয়ে বিনয় একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি বের হয়েছিলো 'কবিতা-পরিচয়' অষ্টম সংকলনে। পুরনো বন্ধু বিমান সিংহের অনুরোধে বিনয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' থেকে প্রকাশিত 'ভারতকোষ'-এ আন্তন পাভলোভিচ চেখভ্-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন। আর এক রুশ লেখক লেরমনতভ-এর জীবনী লেখার প্রস্তাব-অনুরোধও তাঁর কাছে এসেছিলো। এবার কিন্তু বিনয় রাজি হলেন না।[১৯৬]

ষাটের শেষে এসে কবি বিনয়ের ডুবুরির অভিমান হলো! পল্লব সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে 'দৈনিক কবিতা' পত্রিকা (১৯৭০)-র পক্ষ থেকে 'বিশ্বে প্রথম' দাবি নিয়ে একটি কবি-সমীক্ষা আয়োজিত হয়েছিলো। জনপ্রিয়তার নিরিখে ওঠা প্রথম দশ-বারোজন কবির নামের মধ্যে বিনয়ের নামও ছিলো। অথচ, তখনও তিনি ভাষাবিদ্ বলে খ্যাত, কবি নন। আবার, পঞ্চাশের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের দলে তাঁকে উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না। শংকর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ছাপা পঞ্চাশের কবি ও কবিতার সংকলন 'এই দশকের কবিতা' (১৯৬৯ খ্রিঃ), দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদিত পঞ্চাশের কবিদের 'একালের প্রেমের কবিতা' সংগ্রহ (১৯৬৯ খ্রিঃ), শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' (১৯৭০ খ্রিঃ)[১৯৭], বা অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'কবিতার পুরুষ' (১৯৭০ খ্রিঃ)— সবক'টি সংকলনেই বিনয়ের কবিতা গৃহীত হয়েছিলো।

অবশ্য, 'কবিতার পুরুষ' বা 'স্বনির্বাচিত' সংকলনভুক্ত কবিতাগুলি অমিতাভ দাশগুপ্তের নির্বাচিত, বিনয়ের খুব পছন্দের ছিলো না। শৈলেনচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বেলা অবেলা' পত্রিকায় 'আত্মপরিচয় দিতে বসে এ-নিয়ে তাঁর আক্ষেপ গোপন থাকেনি।[১৯৮] প্রায় একই সময়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের পঞ্চম সংস্করণ (সেপ্টেম্বর ১৯৭৩)-এ বিনয়ের কবিতা গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধদেব-জামাতা তখন পালছেঁড়া হালহারা বিনয়কে তাঁর নিজগৃহে আশ্রয় দিচ্ছেন। বিনয়ের বই ছাপছেন, বিনয়কে সাধ্যমতো সুস্থ করে তোলবার জন্য শ্রমসাধ্য প্রয়াস নিচ্ছেন। উল্লেখ্য, 'স্বনির্বাচিত সংকলনটিতে বিনয় তাঁর ঠিকানা হিসেবে ৪০/১ ব্রড স্ট্রিট, কলকাতা-১৯-এ অবস্থিত জ্যোতির্ময়-মীনাক্ষীর বাড়িটির কথা বলেছিলেন।

আমেরিকা থেকে ফিরে ব্রড স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে জ্যোতির্ময়রা উঠলেন গড়িয়াহাট মোড়-বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মুখে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে একটি ছোট বাড়িতে। ততদিনে বেশ সুনাম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই 'কলকাতা' পত্রিকার সম্পাদনা করছেন জ্যোতির্ময় দত্ত। প্রকাশনা শুরু করলেন বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা'-র নতুন সংস্করণ দিয়ে। ১৯৭০-এর ১ মার্চ 'ফিরে এসো, চাকা' নব্যসজ্জায় প্রকাশিত হলো। মূল্য : ৩ টাকা মাত্র। জ্যোতির্ময় দত্ত একটি

অনন্য বিজ্ঞাপনী বয়ান রচনা করেছিলেন।[১৯৯]

সত্তরের শুরুতে 'ফিরে এসো, চাকা'-র 'কলকাতা' সংস্করণ প্রকাশ পেলে বাংলা কবিতার পাঠককুল আন্দোলিত হয়েছিলো। সুদৃশ্য সেই শোভন সংস্করণের লেখক-পরিচিতি অংশে বলা হয়— "এখন তিনি নিয়মিত কর্ম করেন না। ঠিকানা : কফি হাউস, কলেজস্ট্রিট, কলিকাতা।"

১৪ মার্চ, ১৯৭০ তারিখে 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্যসংবাদ বিভাগে 'একটি অসাধারণ কবিতার বই' শিরোনামে 'ফিরে এসো, চাকা'-র সমালোচনা করেন সনাতন পাঠক ছদ্মনামধারী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবিতার পর্যালোচনায় প্রবেশের পূর্বে প্রথম দু'টি অনুচ্ছেদে তিনি লিখলেন— "বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এসো, চাকা' কবিতার বইটি চোখে দেখামাত্রই হাতে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। প্রথমত বিনয় মজুমদারের কবিতা পড়াই একটা বিশেষ ধরণের [ধরনের] অভিজ্ঞতা, তাছাড়া এই বইটির আকৃতিও ভারী [ভারি] প্রীতিপ্রদ, অনেকটা বিলিতি বইয়ের মতন, উগ্রতাবিহীন। পেপারব্যাকের মতন নরম মলাট, পুরো প্রচ্ছদপট জুড়ে বিনয় মজুমদারের মুখের খানিকটা অংশের আলোকচিত্র— এতে তাঁর চোখ দুটি প্রধান, না, ঠিক বলা হলো না। অনেকটা প্রথাগত, তাঁর ঠোঁটের ভঙ্গিটিই বেশী চোখে পড়ে। বইটি প্রকাশ করেছেন মীনাক্ষী দত্ত।

বিনয় মজুমদারের মতন কবি পৃথিবীর যে-কোন দেশেই দুর্লভ। বাংলাদেশ কবিতার দেশ— এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা, যদি সত্যিই তাই হতো, তা হলে বিনয় মজুমদারকে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। অবশ্য মাথায় করে রাখলেই যে বিনয় মজুমদার সেখানে থাকতেন, তা মনে হয় না, ওরকম কুস্থান তিনি অচিরে পরিহার করতেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা।"[২০০]

'ফিরে এসো, চাকা'-র 'কলকাতা' সংস্করণ ও 'দেশ' পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বইটির সমালোচনার প্রকাশ বারবার হারিয়ে যেন বিনয়কে নতুন করে পাওয়া। কিন্তু, মানসিক ব্যাধি যে তাঁকে তাড়া করে ফিরছে। বিনয়কে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার বন্দোবস্ত করতেই হলো বিনয়ের বন্ধুবর জ্যোতির্ময় এবং অন্যান্যদের। বিস্তারিত আগেই বলেছি।...

তিলজলার গোবরা মানসিক হাসপাতালের অধ্যায়টি বিনয়ের জীবনে অন্য কারণে স্মরণীয়। ঘটনাচক্রে এই সময়ই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্রকার শ্রীযুক্ত ঋত্বিককুমার ঘটকের। ঋত্বিককুমার ঘটকও তখন এই হাসপাতালের আবাসিক। এই দুই ভয়ংকর প্রতিভাবান উন্মাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বাংলা সংস্কৃতিজগতের পক্ষে অশেষ গুরুত্বের ঘটনা, যা পরবর্তীতে গভীর আত্মিকতায় পৌঁছবে।

এই হাসপাতালে বসে এই সময় ঋত্বিক ঘটক লিখছেন 'জ্বালা' নাটকটি। তাঁর পরিচালনায় সে নাটক জেল-চৌহদ্দিতে অভিনীতও হচ্ছে। মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিনয় স্বয়ং। এই নিয়ে তৃতীয়বার বিনয়কে রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ভূমিকায় দেখা গেলো; বৌলতলি স্কুলের হস্টেল, প্রেসিডেন্সি হিন্দু হস্টেলের পর মানসিক হাসপাতালে। হাসপাতালের ভিতরে হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশেরও উদ্যোগ বিনয় নিয়েছিলেন। ষাটের দশকের সূচনা থেকেই তাঁর বাঁচা কবিতা, গণিতের নিজস্ব ভুবনে। এই তো আমৃত্য বিবিধ রতন তাঁর!

মীনাক্ষী-কন্যা কঙ্কাবতী দত্ত তাঁর স্মৃতি থেকে ছোটবেলায় দেখা বিনয়ঘটিত একটি ঘটনার কথা মনে করছেন। ভাতের সঙ্গে অবলীলায় অগুনতি কাঁচা লঙ্কা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন বিনয়। তাই "জীবনের যে কোনো ব্যাপারেই তীব্র স্বাদ বিনয় মজুমদারের পছন্দ ছিল"[২০১] বলে কঙ্কাবতীর ধারণা। বস্তুতই হয়তো তা-ই। জীবনের সমস্ত করণই তিনি উন্মাদের মাদকমোহিত ভালোভাসা থেকে করেছেন। কবিতাকে গণিতের কল্পিত মোহনায় নিয়ে গিয়েছেন, গাণিতিকতায় কবিতার তত্ত্বদর্শন ব্যখ্যা করছেন। সাধনা ও আরাধনার তীব্রত্বই কি তাঁর মানসিক বৈকল্যের জন্ম দিয়েছে এর পর!

মানসিক হাসপাতালে বাধ্যতার ভর্তির অব্যবহিত পূর্বে অমিয় দেবের বাড়িতে আশ্রিত থাকার সময়ও তিনি অবিশ্রান্ত গণিতের ধাঁধা নির্মাণ ও চর্চায় রয়েছেন মেতে— "...যেন Δx ও Δy-এর এক রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস লিখছেন। লাল খাতার পর হলুদ খাতা, হলুদের পর সবুজ— কখনো কখনো দিনে পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখে উঠছেন। লিখছেন ইংরেজিতে, মলাটে কোন খাতার নাম 'কনিক সেকশন', কোনটার 'ইন্টার পোলেশন সিরিজ'।..."[২০২] তাঁর গাণিতিক রচনাবলির উদ্ধার হতে পারে কয়েক শতাব্দীর গণিতজ্ঞের কাজ! তবে সে-সময় গণিতের নতুন সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন বলেই বিনয় দাবি করতেন। আর নিরবচ্ছিন্ন গণিত-পরিসরে থেকেই মাঝেমধ্যে লিখতেন দু-একটি কবিতা। কবি-পরিচিতির তুলনায় গণিতবিদ্ পরিচয়ে তিনি তখন অধিক আত্মতৃপ্তি বোধ করছেন। নব্য ক্যালকুলাসের জন্মদাতা বলে ভাবছেন নিজেকে। কবিতার দুনিয়া থেকে পাততাড়ি গোটানোর চিন্তাভাবনাও মাথায় একটু-আধটু ঘুরছে। বদলে গণিতকেই তাঁর সর্বস্ব দেবেন, নবাগত যে 'সিরিজ' তাঁর সিংহভাগ চিন্তনক্ষেত্র জুড়ে বসেছে, তার প্রামাণিকতা তেমন দরকার হলে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির গণিত-বিশারদদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবেন ভাবছেন। এদিকে, বছর পাঁচ-ছয় আগে এই বিনয় নিজেই বাতিল করে বসছেন তাঁর অনূদিত বিজ্ঞানকর্মকে। 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ কভারে তাঁর গ্রন্থসমূহের তালিকা দিতে গিয়ে বিনয় তাঁর অনুবাদকৃত বরেণ্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকাঋদ্ধ 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' বইটিকে 'অনূদিত ভুল গ্রন্থ' বলছেন কেন, তা-ও ভাববারই কথা। থাক সে কথা।...

গণিত ও কবিতার শরিকানায় বে-সামাল মগ্নমন বিনয়কে নিয়ে অমিয় দেব মন্তব্য করেছেন— "আমি তাঁকে দেখেছি বাইরের থেকে, দেখছি এক অদ্ভুত দ্বিধায় তিনি মাঝে মাঝেই যেন বিভক্ত হ'য়ে পড়েন। এই দ্বিধার মূলে কোন সাধারণ সত্যও আছে কিনা জানি না; কবি মাত্রই কি গোপনে গণিত প্রেমিক? ভালেরী শুনেছি কবিতা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘদিন গণিতচর্চা করেছিলেন— আদ্রেঁ জীদেয়া চেষ্টা না করলে আর হয়তো কবিতাই লিখতেন না তিনি, কিন্তু তাঁর যে চর্চার উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধির রহস্যভেদ তথা চৈতন্যের স্বরূপদর্শন। অন্যপক্ষে, বিনয়ের গণিতচর্চা যেন আবেগ প্রকাশ, বুদ্ধির অবলম্বন তাতে থাকলেও আসল তাড়নাটা যেন আবেগেরই। ভালেরী হয়েছিলেন গণিতে মগ্ন, বিনয় প্রায় গণিতে মেতে ওঠেন। দ্রুত আঁক পড়তে থাকে খাতায়, চিহ্নগুলো লাফিয়ে এগিয়ে চলে, রচিত হয় একের পর এক পঙক্তি। যেন কোন কিছুতে ভর করেছে তাঁকে কোন শক্তি যার শরীর নেই কিন্তু মাদকের মতোই তীব্র তার প্রভাব— যেন সবটাই সেই কোলরিজ কথিত দীব্যোন্মাদনা [দিব্যোন্মাদনা]। তুলনায় তাঁর কবিতাচর্চা কত নীরব। চিৎকার নেই একেবারেই, উত্তেজনা বা আবেগ যা আছে তা গোপন— আসলে উপমার রসায়নে অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত। যেন কিছু উপলব্ধি সূত্র রচনা করছেন বিনয়; কোন গণিতজ্ঞ, কোন পাসকাল কিংবা আর্যভট্ট মূলত যা করেন তাই— প্রভেদ এই, বিনয়ের ভাষা আলাদা। তাঁর গণিত নয়, কবিতাই তাঁর ধ্যান, তাঁর প্রকৃত গণিত।"[২০৩]

এ-কারণেই তিনি বিনয় মজুমদার। তাঁর অঘ্রান-পর কবিতাগুলি নিয়ে খেদ প্রকাশ করেও ঋত্বিক "...তবু বিনয় মজুমদার যা লিখেছেন, তাতে তিনি এ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি।"[২০৪] বলে মেনে নেন। পাশাপাশি কিছুটা কর্তৃত্ব নিয়েই যেন বলে ফেলেন— "ঋত্বিক ঘটক সমালোচনায় বন্ধুকৃত্য করে না। নিজে যা ভালো বোঝে তাই লেখে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে অনেক কবিতার মেলায় এই কবিকে সহজেই চেনা যাবে।"[২০৫]

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর একটি উপন্যাসে হিমু চরিত্রটির মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন— "অতি মেধাবীরা তারছেঁড়া মানুষ হয়।... তারছেঁড়া মানুষের জন্য মুহূর্তের বাসনার মূল্য অসীম।"[২০৬] সম্যক বিনয়-অনুধাবনে এই আপাতনিরীহ কিন্তু অতলস্পর্শ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। বিনয়ের কবিতা, গণিত, রাজনীতি, পূর্বরাগ, বীতরাগ, সঙ্গছুট, সখ্যত্যাগ, একালুতা ইত্যাদি যাবতীয় বহিঃপ্রকাশই নিদেনপক্ষে তাঁর সেই-সেই মুহূর্তগুলিকে প্রাথমিকভাবে হলেও চরিতার্থ করেছেই!

অবারিত সুরের মেলায় সুরে-সুরে সুর না মেলায় যেন শেষান্তে তাঁরই একা আবরিত অবস্থিতি। তাঁর পরিবারও সম্ভবত এক ধরনের প্রস্তাবিত দূরত্বই বজায় রাখতে পছন্দ করেছে তাঁর সঙ্গে। ১৯৭০-এ মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার সময় বিনয়ের বড়দা অনিলবরণের স্বাক্ষর চাইতে

গিয়ে এই দূরত্বের অংশপরিচয় পেয়েছিলেন জ্যোতির্ময় দত্ত। সেই সূত্রে জ্যোতির্ময়ের উপলব্ধি হয়েছিলো এমনই— "বিনয় অনুভূতিপ্রবণ ও কোমলচিত্ত বলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল, মজুমদার পরিবারের অন্যেরা শক্ত। তাঁরা দূরত্বকেই পরিণত করেছেন চারিত্রিক বর্মে।"[২০৭] ঠাকুরনগর গেলে জ্যোতির্ময়বাবুকে একমাত্র উষ্ণভাবে গ্রহণ করতেন রেণু বসু ওরফে বুচি।[২০৮] বিনয় মজুমদার সুস্থ হয়ে ফিরে এলে তাঁকে বাড়ির কোথায় থাকার জায়গা দেওয়া হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে বিপিনবাবু যা বলেছিলেন, জ্যোতির্ময় তার সাক্ষ্য দিয়েছেন— "তিনি জমির প্রান্তে একটি টালির চালাঘর দেখিয়ে দিলেন। ঐ ঘরটির নাম দিয়েছিলেন 'শান্তিনিকেতন'— হওয়া উচিত ছিল 'দূরত্ব'। অবশ্য প্রকৃতই যখন বিনয় বাড়ি ফিরল, তাকে অতদূরে নির্বাসিত করেননি বিপিনবিহারী।"[২০৯]

শিমুলপুর-জীবন :

লুম্বিনী পার্ক-ফেরত বিনয় এই প্রথম এ-বঙ্গে তাঁর আদত খুঁটি ঠাকুরনগরে স্থায়ী বসবাস করতে শুরু করলেন। পারিবারিক নিশ্চিন্তি ও নিরাপত্তার ঘেরাটোপে, বাবা-মা'র কাছঘেঁষা বিনয় এ-সময় বেশ সুস্থই ছিলেন কিছুদিন। কিন্তু, কোনও নিটোল পার্থিব ক্যালেন্ডার তো বিনয়ের জন্য নয়! নিয়তি তাঁর জীবনগণিত কষবে; আর কবিতায়, গণিতে আক্রান্ত বিনয় এক পরম কেন্দ্রাতিগতায় ক্রমায়ত জীবনবৃত্তের, সংসারবৃত্তের, বিষয়বৃত্তের বাইরে চলে চলেছেন।

শিমুলপুর গ্রাম থেকে চিঠিপত্রে বিনয় কোলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার চেষ্টা করেছেন অন্তত প্রথম দিককার কিছু বছর। অমিয় দেবকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া একটি খোঁজ জানিয়েছেন যে, ইংল্যান্ডের কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি তাঁর প্রণীত গণিতের তত্ত্বসূত্রগুলি পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়েছে। খবরটি কানে আসা মাত্রই বিনয় কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। এমনকি, পোস্টকার্ডের নিচে সইও করেছেন 'ইওর ম্যাথ্‌মেটিশিয়ান'— এই মর্মে। আবার সেই পুরনো মানসিক অস্থিরতা। আবার কফি হাউস, আবার লুম্বিনী-পূর্ব চেহারা। সন্দেহে, ভয়ে কখনও কুঁকড়ে আছেন, কখনও বা হিংস্রতায় চৌবৃত্তের দুনিয়াকলকে তিনি জব্দ করতে চাইছেন। প্রধানত গণিত নিয়ে কথাবার্তায় পাচ্ছেন আনন্দ।[২১০]

বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় 'বিশ্ববাণী' থেকে 'বাল্মীকির কবিতা' (শ্রাবণ ১৩৮৩/ ইং. ১৯৭৬ খ্রিঃ) ছেপে বের হলে অশ্লীলতার অভিযোগে বিনয় বিদ্ধ হলেন। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-তেও প্রকৃতিবর্ণনার আড়ালে যৌনাঙ্গ ও যৌনমিলনের কথাই নিহিত ছিলো, কিন্তু তা ছিলো প্রতীকে, রূপকে শিল্পরূপান্বিত। কিন্তু, গোরাবাজারে দিদির বাড়ির অবৈদ্যুতিক পরিবেশে মোমবাতি অথবা সরষের তেলের টিমটিমে মাটির প্রদীপ জ্বেলে বিচিত্র আলোয়-

আঁধারে বিনয় লিখলেন তাঁর ভুট্টা, গুহা বা চাঁদের মলিন কবিতাগুলি। শব্দে শব্দে যৌনোৎসব হলো বটে, কবিতা হল না। শ্রমজীবীর কাছে যা ক্রিয়া, বুদ্ধিজীবীর কাছে তা-ই শিল্প— একই তো যৌনতা ভিন্ন বয়ানে রূপরেখায়িত! বিনয়ের কবিতার ভূষণতুল্য যৌনতাই তাঁর কবিতার দূষণের কারণ হয়ে উঠলো এই সময়। চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্তির কাছে হলো নিঃশেষে সমর্পিত।

'বাল্মীকি' পত্রিকায় এ-বইয়ের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো বলে কবি নামকরণ করেছিলেন 'বাল্মীকির কবিতা'। বইটির জন্য খুব সুন্দর মলাট এঁকেছিলেন শিল্পী শুভাপ্রসন্ন। কিন্তু প্রকাশক ব্রজকিশোর মণ্ডল বই বিক্রি শুরু করার পর অনেক ক্রেতা নাকি ঘুরে এসে 'অশ্লীল' বলে বই ফেরত দিয়ে যান, পয়সাও ফেরত চান তাঁরা। লালবাজার থেকে বই বিক্রি বন্ধ করবার নির্দেশ আসে। মূল বইয়ের পঞ্চান্ন থেকে বাহাত্তর পৃষ্ঠা অবধি ছিঁড়ে ফেলেন প্রকাশক। অথচ সেই খণ্ডিত পুস্তকটি কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বাজারে বিকলো। এ'রকম সময়েই শোনা যায় গোর্কি সদনে 'অশ্লীল কবি' বিনয় মজুমদারকে এক কবিতাপাঠের আসর থেকে বিতাড়িত করা হয়। একটিও নতুন যৌন-প্রতীক 'বাল্মীকির কবিতা'-গুলিতে ছিলো না বললে মিথ্যাচার করা হবে। কিন্তু অসংখ্য না-কবিতার দস্তাবেজের তলায় তাঁর দু'একটি কবিতাপম গঠন চাপা পড়ে গেছে। অন্যদিকে, 'দেউটি'-র মতো কিছু পত্রিকা তাঁর এ-জাতীয় কবিতাগুলিকে ধারাবাহিকতার সঙ্গেই প্রকাশ করে যেতে থাকে। আবার কেউ-কেউ 'বাল্মীকি'-র বিনয়কেই 'এ যুগের বাল্মীকি' বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁদের অনেকেরই মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতানির্মাণের অন্যতম এর বেশ কিছু কবিতা।[২১১]

'বাল্মীকি'-র কবি বিনয় তখন শহরের ঊর্মিমুখরতা থেকে যোজন দূরে— গাঁয়ের সবুজে ধূসর জীবন বয়ে ফিরছেন। হৃদয়ে পুরনো খাপে জং ধরলে তবু এই উদাসীন গ্রামীণ বিনয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় দেব। শিমুলপুরের 'বিনোদিনী কুঠী'-র নিরালা এক ভালোবেসে একা কবির জন্ম-জন্মান্তরের সাকিনঠিকানা হয়ে দাঁড়ালো। এ বাড়ি কবির মা'র নামাঙ্কিত। শরীরী মৃত্যুর পরও নামফলকে থেকেই যেন বিনোদিনী প্রহরাধীন রেখে দেবেন অভিমানী, আত্মধ্বংসী, বহ্নিপ্রতিভা ছোট ছেলে বিনয়কে। সংস্কারের অভাবে আশির দশক থেকে যে বাড়ি বিভিন্ন জ্যামিতিক, অজ্যামিতিক নক্শায় ভাঙছে; তার চলটা-ওঠা, পলেস্তারা-খসা একটি ঘরে বিনয় তাঁর অসুখের সঙ্গে সহবাস করে গেলেন বাকি জীবন। মধ্যে ক'বার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতাল, হাসপাতাল থেকে পুনরায় 'বিনোদিনী কুঠী'-র প্রায়ান্ধ কামরা। অথচ, মসৃণ জীবনের মহাসড়ক একদা যেচে এসেছিলো তাঁর কাছে। কিন্তু, বিনয় যে তখন ঝড়কে মাঝি করে বিপন্ন-সায়র উদ্ধারে নেমেছেন! কবিতার জন্য ছেড়েছেন চাকরির নিশ্চিন্তি; বৃদ্ধ, অথর্বপ্রায় বাবা-মা'র দিকে তাকিয়ে ছাড়ছেন প্রবাসের লোভনীয় আমন্ত্রণ[২১২]; কিন্তু নিজের জন্য ছাড়তে পারলেন না কিছুই!

স্নায়বিক চঞ্চলতা তাঁকে কোনও কিছুতেই থিতু হতে দেয়নি। ঘরের বদলে ঘোর আর ঘোরের ঘূর্ণিতে মুচড়ে ওঠা বেদনা-হলুদ বৃন্ত তাঁকে সব পেয়েছির দেশোয়াল হতে ব্যহত করে গেলো। আর পুড়তে থাকা কবির কলম সর্বাধিক সিদ্ধি পেলো 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রবাদপ্রতিম কাব্যসুমচ্চয়ে। অথচ, রচনার অনিবার গতিতে বাধা পড়লো, মানসিক চিকিৎসাক্রমে প্রায় ছ'মাস শীতঘুম নিলো কবিতা। ছাড়া পেলে উন্মাদের বাঁধ খোলার মতোই অবরুদ্ধ পঙক্তিগুলির স্বাদকোরক ধুলোয়, ঘাসে ছড়িয়ে কুড়োয় মুক্তির লবণ। বিনয়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা সৃষ্টির মুহূর্তগুলি এইরকমই। 'ফিরে এসো, চাকা'-র নির্মাণকাল নিয়ে ভাবলে তাই বিস্মিত হতে হয়। বিনয়াবিষ্ট তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন— "রচনাকালের দিকে চোখ রেখে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলি পড়লে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় যেন কোনো আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে তীব্র গতিতে লাভা উদিগরণ [উদগিরণ] করতে শুরু করেছে অথবা যেন ভূমিকম্পে বা তুমুলঝড়ে উত্তাল হয়ে পড়েছে কোনো সমুদ্র। পাতার পর পাতা উল্টে যেতে যেতে মনে হয় পর-পর এতগুলো মহৎ কবিতা রচনা করা সম্ভব হলো কী ভাবে?"[২১৩] ৮ মার্চ ১৯৬০ খ্রিঃ থেকে ২৯ জুন ১৯৬২ খ্রিঃ-র মধ্যবর্তী সময়ে 'ফিরে এসো, চাকা'-র ৭৭টি কবিতাকোহিনূর জন্ম নিয়েছিলো। মধ্যে ২৪ জুলাই ১৯৬১ থেকে ২৬ জানুয়ারী ১৯৬২ অবধি প্রায় ছ'মাস কবির (কলমের) মনোবিকারজনিত বন্ধ্যাত্ব। জীবনে প্রথমবার হাসপাতালবাসী হবার অব্যবহিত পূর্বে (অর্থাৎ সুস্থ কবিত্বে ও মানবত্বে করুণাকর ছেদ পড়বার আগের দিন) '৬১-র ২৩ জুলাই তারিখে লিখিত দু'টি কবিতায় বিনয় তাঁর অতিখ্যাত প্রেমকল্প থেকে 'সাবধানতার পদাঘাতে' কিছুটা পিছনে ফিরতে চাইলেন, অথচ কবিপ্রেমিকের স্বভাব তো তা নয়! অনুজ জয় যে লিখেছিলেন— "আগুন থেকে জানি এসব, বাতাস থেকে জানি/ দু'জন অসাবধানী আমরা আমরা, দু'জন অসাবধানী!"[২১৪] কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'-র মাঝপর্বেই বিনয়ের আজানগানে কী যেন বিপন্নতা। লিখছেন— "বিদেশী ভাষায় কথা বলার মতন সাবধানে/ তোমার প্রসঙ্গে আসি; অতীতের কীর্তি বাধা দেয়।/ হে আশ্চর্য দীপ্তিময়ী, কীটদষ্ট কবিকুল জানে,/ যারা চিত্রকর নয়, তাদের শৌখিন শিল্পায়নে/ আলেখ্যের মুখে চুল, ওষ্ঠ— সব কিছু আঁকা হয়/ কিন্তু তবু সে-মুখের অধিকারিণীর স্নিগ্ধ রূপ/ আলেখ্যে আসে না;..."[২১৫] এবং "তিন পা পিছনে হেঁটে পদাহত হ'য়ে ফিরে আসি।/ আবার তোমার কথা মনে আসে; ধূমকেতুর মতো/ দীর্ঘকাল মনে রবে তোমাকে; পূর্ণাঙ্গ জীবনের/ জটিলতা, প্রতিঘাত বালকের মতন সাগ্রহে/ ভালোবাসি;..."[২১৬]। আর, হাসপাতাল ছাড়ার পরের দিন তাঁর নির্মাণ যেন নবআনন্দে জাগা তবু এলানো তস্‌বির : আনন্দভৈরবী— "মুক্ত ব'লে মনে হয়; হে অদৃশ্য তারকা, দেখেছো / কারাগারে দীর্ঘকাল কী-ভাবে অতিবাহিত হ'লো।/ অথচ বাতাস ছিলো; আবদ্ধ বৃক্ষের পাতাগুলি/ ভাষাহীন শব্দে, ছন্দে এতকাল আন্দোলিত ছিলো।/ অদৃশ্য তারকা, আজ মুক্ত ব'লে মনে হয়; ভাবি,/ বালিশে সুন্দর কিছু ফুল তোলা নিয়ে এত

ক্লেশ।"[২১৭]...

বিনয়ের সৃজনী খুব সুষম ধারাপাতে হয়নি কখনওই। কখনও তাঁর জ্যা সময়ের ভগ্নাংশে খেলছে, কখনও আবার মীনশিকারীর স্থৈর্যে তা স্থানু। কিছু নির্জীব প্রহর ঝরে গেলে থেকে গেছে সোনালি বীজলহর : 'ফিরে এসো, চাকা' কিংবা 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। ডিস্‌লেক্সিকদের মতো বিনয়ের দৃষ্টি কি অতিক্ষম ছিলো? এমনটাই কিন্তু মনে করেছেন মীনাক্ষীতনয়া কঙ্কাবতী।[২১৮] বিন্দুতে ইন্দুবোধ হবেও বা তাঁর ঈশ্বরীধেয়ান!

'কবিতীর্থ'-র বিনয় স্মরণ সংখ্যায় (মাঘ ১৪১৩) 'কলেজ স্ট্রিটের মসীহা' শিরোনামের একটি লেখা প্রকাশ পেয়েছিলো। হিন্দিভাষী উপন্যাসকার শারদ দেওড়া ভারতের ষাটের দশকের সাহিত্য-আন্দোলনকে মুখ্য করে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, যার একটি অংশ বিনয়ভিত্তিক। সুবিমল বসাকের অনুবাদকৃত নির্বাচিত অংশই হলো ওই প্রকাশিত লেখাটি। প্রত্নজীবনে প্রবেশের পূর্বেকার প্রস্তুতিপর্বের (১৯৬২ খ্রিঃ) বিনয়কে এখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে—

"...আমাদের জেলারেশনের [জেনারেশনের] সবচেয়ে বেশি সেনসিটিভ ও পাওয়ারফুল কবি।...

"...আমাদের মধ্যে অনেকেই এই যুগের কোনো এক অভিশাপ স্ব-স্কন্ধে বয়ে নিয়ে চলেছে; কামু'র সিসিফাসের মত সে এক অ্যাবসার্ড এবং অর্থহীন ভার বয়ে চলেছে। পরিণামে দেখা যায় আমাদের মাঝে অনেকেই অসময়ে বার্ধক্যের শিকার হয়ে ওঠে। বিনয়দা আমাদের জেনারেশনের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সেন্সিটিভ কবি, এই অভিশাপের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত শিকার তিন [তিনি]। তারপর, কিছুটা বিনয়দার মত বিড় বিড় করে বন্ধুটি আপন মনে বলে, এক রাক্ষসী-অভিশাপ কোনো-না-কোনো রূপে ভয়ঙ্কর ছায়ার মত আমাদের সকলের পশ্চাদনুসরণ করে, আমাদের অসময়ে বৃদ্ধ করে তোলে। এই ভয়ঙ্কর ছায়ার কয়েকটা রূপ...ক্ষুধা, বেকারী, অনিশ্চয়তা, সেক্স, সন্দেহ, মদ, চারমিনার, গণিকা, ভয়, মৃত্যু এবং প্রেম...,

.....

"হ্যাঁ, প্রেম বিনয়দাকে অসময়ে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।"[২১৯]

লেখাটিতে শারদ দেওড়া বিনয়ের গায়ত্রীবিষয়ক উন্মাদনা; পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের মিশেলে ইতিহাসের ট্র্যাজিক উল্লাস; এমনকি, বিনয়-গায়ত্রী সমাচারের প্রকাশ্যগোপনতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে বিনয়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগে ছাত্রত্ব দাখিল করতে দেখানো হলেও তা নয় বস্তুত। কিন্তু, কবিতা তো কবির দর্শন, এই গভীর দর্শনে অশুদ্ধি

নেই!

কিন্তু, প্রকল্পিত কবিতাকেবিনে যাঁকে নিয়ে বিশুদ্ধ আলাপচারে বসবেন বলে ভেবেছেন, তাঁকেই মনোবেড়ি পরাতে কোথায় যেন বিনয়ের ভুল হয়ে গেছে। বিপুল আলোচিত, সমাদৃত 'ফিরে এসো, চাকা'-র ভূমিকায় জ্বলজ্বলে হরফ হয়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী না হয় থেকে গেলেন, বিনয়ের তরফে মজুমদার না হয়ে হলেন স্পিভাক; তবু, যথেষ্ট উচ্চারিত নাম বিনয় মজুমদার সম্পর্কে বরাবরের গ্রন্থভূক পাঠিকা, পরবর্তীর ভূবিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপিকার এতটা অখেয়াল একটু অবাক করার মতোই।

একসময় কোলকাতায় তরঙ্গতোলা ও মানাহত বিনয় স্বগ্রামে সেঁধলেও জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় দেবকে কিন্তু অনেকটা সময় অবধিই তাঁর সুহৃদ্বরের ভূমিকায় দেখা গিয়েছিলো। বিনয়কে দেখতে এসে তাঁর ঘরের এত্তা জঞ্জাল একা হাতে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছেন অমিয় দেব— এমনও শুনতে পাওয়া যায়। ঠাকুরনগর এলাকা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ জনপদ তখনও নয়। আদ্যোপান্ত নাগরিক কবিয়াল বিনয় সেখানে '৭০-এর দশকের সূচনালগ্নে গ্রামীণ বাউল সেজে বসলেন । মা, বাবা, বুচি প্রমুখ তাঁর আশ্রয়, তথাপি আশ্রম নয়! এদিকে উদ্বাস্তুপ্রধান দুর্বল অর্থনীতিসম্বলিত গ্রামাঞ্চলের পক্ষেও স্বেচ্ছানির্বাসিত এই মহাপ্রতিভাধর ব্যক্তিটিকে পড়ে ফেলা সম্ভব হলো না। বিপর্যাস তাঁর সামনে আলজিভ শানালেও তাকে আলতামিরা ভেবে সে-যাবৎ গড়ছেন 'অধিকন্তু' (১৯৭২ খ্রিঃ) ও 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' (১৯৭৪ খ্রিঃ)-র রেখলেখ।

অতঃপর বাল্মীকির কাল। চাপা ব্যথা ও মাপা রসদে চ্যাপ্টা হয়ে যেতে যেতে বিনয়ের দমিত কলম যে ধরনের কারুবাসনায় মেতে উঠলো, তা প্রমিত নয়। কবিতাচরণের যৌনতাকৈবল্য বা যৌনবৈকল্য তাঁর মুকুটে জোগালো 'পারভার্টেড সেক্স মঙ্গার'-এর পালক। বাংলার বুদ্ধিজীবীমহলে বিনয় ক্রমশই রবাহূত হয়ে এলেন। র‍্যাঁবো-র একটি লেখার 'আমি'-র সঙ্গে এই বিনয়ের অদ্ভুত মিল। নির্বাচিত অংশ :

"আমার কথা এইবার। আমার পাগলামির আরো একটি কাহিনী।

"বহুদিনের গর্ব আমার। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিসর্গশোভার ওপরই আছে আমার দখল— আধুনিক কাব্য ও চিত্রকলার গগনস্পর্শী খ্যাতির আড়ালে জেনেছি তার চূড়ান্ত অসারতা।

"আমাকে টানে অর্থহীন ছবি, দরজার ওপর দিকটা, সাজসজ্জা, ক্রীড়কের পট, বিজ্ঞাপন-ফলক, লোক-শিল্পের রংচং, সেকেলে সাহিত্য, গির্জার ল্যাটিন, বানান-ভুলে ভর্তি

আদিরসের বই, প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী, রূপকথা, শৈশবের ছোট বই, পুরনো গীতি-নাট্য, সরল অস্থায়ী, অমার্জিত ছন্দ।

"স্বপ্নে দেখেছি ধর্মযুদ্ধ, নামহীন আবিশকারের নেশায় দেশান্তর যাত্রা, হুজুগশূন্য রাষ্ট্র, ধর্মে-ধর্মে গুমোট লড়াই, নীতি-সংক্রান্ত বিপ্লব, জাতিতে জাতিতে ও মহাদেশে কতো ওলটপালট, বিশ্বাস করেছি সমস্ত জাদুমন্ত্রে।

"বার করেছি স্বরবর্ণের রং— আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ— নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম ক্রিয়াপদ আবিষ্কার করতে যা একদিন-না-একদিন প্রযোজ্য হতে পারবে সমস্ত অর্থে।..."[২২০]

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই কোচিং সেন্টারে পড়িয়ে পেশাপ্রবেশ ঘটেছিলো বিনয়ের, বিনয়ের দরাজ সাহায্য নিয়ে কখনও চার মাসের বাড়িভাড়া মিটিয়েছিলেন কবি শক্তি, পেঙ্গুইন প্রকাশিত 'নিউ রাইটিংস ইন ইন্ডিয়া' বইতে শক্তি, বিনয়, সুনীল ও সন্দীপনের লেখা একত্রে জায়গা করে নিয়েছিলো; কবিতার ধুমজ্বর, কফিহাউসের টেবিলের সম্পর্ক, প্রতর্ক ইত্যাদি সমস্তই একদিন বিনয়ের সংক্রম হারালো। ১৯৭৪ খ্রিঃ-র পরে আর কোনওদিনই শক্তি-বিনয় সাক্ষাৎ হয়নি। মহানগরের বলয়বৃত্তের বাইরে তখন অজ-গাঁ ঠাকুরনগরে বিনয় থিতু হতে লড়ছেন। বাল্মীকি-অধ্যায়ের পর আত্মঘৃণায়, দ্বিধা ও সংকোচে খোলসে ঢুকে যাওয়া কবি তাঁর কাব্যসমগ্রের সম্পাদনাকার শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শেষ একটি অনুরোধ করেছিলেন যে, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে বাদ দেওয়া 'বাল্মীকির কবিতা'-র ভুট্টা, গুহা, চাঁদ বিষয়ক কবিতাগুলি যেন কোনওভাবেই কাব্যসমগ্রের অন্তর্ভুক্ত করা না হয়।[২২১]

এই মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াই বস্তুত বিনয়জীবন। এরপর কবির সংস্কার, সংস্কৃতি সব সমাজমাপনীই জরিপ নেবে। ত্রস্ত, নারাজ বিনয়কে সরকারি খরচে চিকিৎসা করাতে চেয়ে সরকার-নিযুক্ত পুলিশ ঘরের দরজা ভেঙেছে, বেঁধে নিয়ে গিয়েছে তাঁকে। উদ্দেশ্য সৎ ও বৃহৎ হলেও ঠিক মহৎ বলা যায় না। কেননা, কবিমনের খেলাঘরের দরজার নাগাল পাওয়া যেত প্রেমে, শ্রমে নয়! বিনয় নামক একটি স্বপ্নউড়ান রেডাররাজ্যের মাঝ আকাশেই কার্যত নিশ্চিহ্ন হলে অদ্বয় ব্ল্যাকবক্সটির পাঠোদ্ধার করলেন না কেউই যেখানে "প্রেম ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি" ভাবার্থের লিখন ধুলায় ধূলি হয়ে রয়েছে। নষ্ট টিউব তাঁর জীবননক্ষত্রে গ্রহণের সংকেত দেয়। দুর্ঘট অন্ধকারে কোনও বনলতা সেনের মুখোমুখি নয়, বিনয় নিঃসঙ্গ জাগছেন। আর মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা নেই বলে নাছোড় মশারা টেনে নিচ্ছে

বিনীত ফ্লুইড। যে রক্ত সঞ্জাত শিশুর পাওয়ার কথা, তা পেলো তুচ্ছ মশককুল! এক বড়দা অনিলবরণ ছাড়া অন্য ভাই বা বোনেরা বিনয়কে নিয়ে তিলমাত্র ভাবিত হননি। উত্তরাধিকার সূত্রে এ-সময় বিনয়ের বেশ খানিকটা অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। তার বিনিময়ে হলেও বিনয়ের জন্য উন্নততর চিকিৎসা বরাদ্দ করতে তাঁর পরিবারে কোনও উদ্যোগী উদ্যমী পুরুষ চোখে পড়ে না। অনিলবরণও অথর্ব, অশক্ত ছোটভাইকে মাসে-মাসে কিছু টাকা পাঠিয়েই দায় সারেন। কিন্তু দায়িত্ব বলতে যা বোঝায়, তার ভার নিতে মজুমদার পরিবার কখনওই সেভাবে সম্মত হন না। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল সূচিত হয়। '৭৭-এ বাংলার কুর্সি দখল করে বামপন্থী সি.পি.আই. (এম. এল.)– মতাদর্শগত মিল একদা যে দলের ছাত্র-সংগঠনটির কাছাকাছি এনেছিলো তাঁকে। উদ্বাস্তুদ্বীপ মরিচঝাঁপিতে সংঘটিত '৭৯-র বর্বরোচিত হত্যালীলার নায়কেরা কিন্তু 'উদ্বাস্তু কবি' বিনয় মজুমদারের ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারে আশাব্যঞ্জক প্রয়াস নিলো। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিনয়ের চিকিৎসা যা হয়েছে, সিংহভাগ তা সরকারি বদান্যতায়। বনগাঁ বিধানসভা কেন্দ্রের তদানীন্তন বিধায়ক অসীম বালা নিছক দেখনদারি সম্বর্ধনার ঊর্ধ্বে উঠে রাজনীতিকে কবি ও কবিতাবিষয়ে ভাবাতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সে-সময়কার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও পরবর্তীর মুখ্যমন্ত্রী শিল্পীমন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় অসুস্থ কবির জন্য সামান্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য, মাসান্তে নিয়ম করে বারাসতের ট্রেজারিতে গিয়ে টাকা তুলে আনা বিনয়ের পক্ষে বারদুয়েকই সম্ভব হয়েছিলো। একটি কবিতায় বিনয় একবার তাঁর ট্রেজারি-গমন নিয়ে যা লিখছেন, তাতে বিনয়ের পক্ষে তা খুব সুখকর ও সম্মানকর ছিলো— এমনটা মনে হচ্ছে না :

"আজ বারাসাতে গিয়ে বারাসাতে বেড়াবার পথ
ভালো করে মনে রেখে, এখন আবার লিখে রাখি।
রেলের ওভারব্রিজ দিয়ে নেমে সিধে পুব দিকে
সোজা সামনের দিকে হেঁটে গেছিলাম।
কিছুদূরে গিয়ে ডান পাশে দুটি কাঁঠাল-পাদপ
কাঁঠাল-পাদপে এসে বাম দিকে সমকোণে ঘুরে যেতে হবে
সামান্য কিছুটা দূর হেঁটে গেলে
অসমাপ্ত সরকারী সুবিশাল অট্টালিকা রয়েছে
এই হল ট্রেজারিটি, আমার গন্তব্যস্থল, আমি আজ

গেছিলাম ঠিক এইখানে

পুনরায় এইখানে যেতে হবে পুনঃপুনঃ পৌনঃপুনিক দশমিকের মতন।”

(বিনয় মজুমদার, ‘আজ বারাসাতে গিয়ে’, বিনোদিনী কুঠী, অফবিট পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, পৃ : ৫১)

মেডিকেল কলেজের এজরা ওয়ার্ডের উনিশ নম্বর বেডটা বিনয়ের জন্য প্রায় সংরক্ষিতই ছিলো। বিনয়ের ক্রান্তিকাল আসতে তখনও দেরি। এদিকে, ধারাবাহিক রোগগ্রস্ততা বিনয়কে চূড়ান্ত সন্দেহবাতিক করে ছেড়েছে— তাঁকে ধরে বেঁধে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে বুঝি তাঁর কবিতা বেহাত করার অভিসন্ধি আছে! প্রসঙ্গত, জ্যোতির্ময় দত্তের বাড়িতে বাসকালে করাল অসুস্থতার নৈরাজ্যে পদার্পণের শুরুতেও বিনয় এমন সন্দেহ করতেন যে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতা চুরি করে আমেরিকায় বসে নিজের নামে ছাপাচ্ছেন। এমনকী, বাড়ি-জমি বেহাত হয়ে যাওয়ার অজ্ঞাত আশঙ্কাও বিনয়ের সন্দেহবীজকে বারবার বেআব্রু করেছে।...

এই সময়পর্যায়ে রাষ্ট্রবিশ্বের বিবিধ বদল, সংঘটনগুলি বিনয়বিশ্বের বাহিরালি। ’৭৬-’৭৭-এ ব্রিটিশ ব্যান্ডের হাতে ‘পাঙ্ক রক’-এর উদ্ভাবনা, চলচ্চিত্রে স্পেশাল এফেক্ট-এর প্রণয়ন এবং বরেণ্য পরিচালক স্টিভন স্পিলবার্গের হাতে মোড়-ফেরানো ‘স্টার ওয়ার্স’ (১৯৭৭ খ্রিঃ) ও কয়েক দশক জুড়ে অনুবর্তী ‘ক্লোজ এনকাউন্টার্স অব দ্য থার্ড কাইন্ড’, ‘ইটি’, ‘জুরাসিক পার্ক’-এর মুক্তি, ’৭৮-এ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং ডাঃ রবার্ট এডওয়ার্ডের হাতে পৃথিবীর প্রথম (২৬ জুলাই) এবং বাঙালি চিকিৎসক-বিজ্ঞানী ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে পৃথিবীর দ্বিতীয় (৩ অক্টোবর) নলজাতিকা— যথাক্রমে লুই ব্রাউন ও দুর্গার জন্ম, প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো-হত্যা (৪ এপ্রিল, ১৯৭৯ খ্রিঃ), সোভিয়েত বাহিনীর আফগানিস্তান আক্রমণ (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিঃ), বিখ্যাত বিট্‌ল জন লেনন-হত্যা (৯ ডিসেম্বর, ১৯৮০ খ্রিঃ), ব্রিটিশ কলোনি রোডেশিয়া থেকে আফ্রিকা গণতন্ত্রের স্বাধীন দেশ হিসেবে জিম্বাবোয়ের আত্মপ্রকাশ (১৮ এপ্রিল, ১৯৮০ খ্রিঃ), মিশরের প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাত-হত্যা (৬ অক্টোবর, ১৯৮১ খ্রিঃ), দুঃসাধ্য কর্কটকীটের বিপক্ষে জামাইকার কিংবদন্তি রেগে-শিল্পী বব মার্লের পরাজয়— প্রয়াণ (১১ মে, ১৯৮১খ্রিঃ), পৃথিবীব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রাগার ধ্বংসের দাবিতে মধ্য লন্ডনে আয়োজিত একটি প্রতিবাদ-সভায় প্রায় ২.৫ লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান (২২ অক্টোবর, ১৯৮৩ খ্রিঃ), শ্রীলংকায় তামিল-সিংহলি দাঙ্গা ও লোকক্ষয় (২৭ জুলাই, ১৯৮৩ খ্রিঃ), দীর্ঘদিনের ক্যারিবিয়ান আধিপত্য খর্ব করে প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় ভারতের (১৯৮৩ খ্রিঃ), মার্কিন সংস্থা ‘ইউনিয়ন কার্বাইড’-এর ভোপালস্থিত ফ্যাক্টরিতে মর্মন্তুদ গ্যাস-দুর্ঘটনা, প্রভূত প্রাণহানি (১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খ্রিঃ); স্বীয় দেহরক্ষী

কর্তৃক ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি-হত্যা (৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রিঃ)[২২২]— এসব লড়াই, টানাপোড়েন ইত্যাদির উল্টোপ্রস্তাবে বিনয়ের বিনতা যেন 'ফিরে চল্ মাটির টানে'!

'বাল্মীকির কবিতা'-র প্রায় দশক পরে প্রকাশ পেয়েছিলো 'আমাদের বাগানে' (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ খ্রিঃ) কাব্যগ্রন্থটি। ইতিমধ্যে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে প্রয়াত হয়েছেন কবির বাবা ও মা। বিনয় যখন পাকাপাকি দেশের বাড়িতে ফিরে আসেন তখনই বিপিনবিহারী অবসরপ্রাপ্ত। ১৯৮৪ খ্রিঃ-র ৪ জুলাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিলো ৯৩। কর্কট রোগের সঙ্গে বেশতক যুঝে তাঁর মাস ছয়েক আগে (১ অগ্রহায়ণ, ১৩৯০; শুক্রবার, রাত ১০টা ৩৪ মিনিট) 'বিনোদিনী কুঠী'-র মায়া ত্যাগ করেছেন বিনোদিনী মজুমদার। এরপর যে বিনয়কে আমরা দেখব, সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের সংঘাতে সর্বাংশে যা ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এগোবে; নিষ্ঠুর আবর্তে আন্দোলিত এক কবিপ্রাণ কোনও তেত্রিশ বছর ধরে কথা না-রাখার কথা ভেবে ভেবে মৃত্যুর জন্য নিমন্ত্রণপত্র করবে প্রস্তুত। আবার মা ও বাবার প্রয়াণের মধ্যবর্তী ঝোড়ো সময়টিতেই বুচির সঙ্গে মজুমদার পরিবারের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, জীবনসমুদ্রের পালছিন্ন ডিঙিদার বিনয়ের সন্দেহপ্রবণতা যার নেপথ্য কারিগর। 'নানা কথা' নামের একটি লেখায় তার ইঙ্গিত মেলে— "মা যেই মারা গেল তার কিছুক্ষণ পরে মায়ের হাতের দিকে চেয়ে দেখি মায়ের হাতে পরা সোনার চুড়ি নেই, কানে সোনার দুলও নেই। কে যেন খুলে নিয়েছে। আমি আন্দাজে ভাবলাম যে এইসব স্বর্ণালঙ্কার নিয়েছে বুচি (বুচি আমাদের ঝি)। এটা আমার অনুমানমাত্র। হয়তো মায়ের স্বর্ণালঙ্কারগুলি অন্য কেউ নিয়েছিল। এটা হচ্ছে মানুষের চরিত্র।"[২২৩]

তবু, যথার্থ প্রমাণহীন এই সন্দেহের প্রকাশ তাঁকে যে দগ্ধবিদ্ধ করেছে, এই তো কবিজনোচিত প্রমিতি— ফুলে কাঁটা ও ভুলে মনস্তাপ যার মৌল ধর্ম। কিন্তু, মজুমদার পরিবারে বিনয়ের মতো পালকমন নিয়ে আর তো কারও জন্ম হয়নি। তাই তাঁদের বিনয়চারণায় ফুটে ওঠে তুখোড় হিসেবিয়ানা, পরস্পর দোষারোপের নির্লজ্জা। ১৯৮৮-তে হাসপাতালে বসে বনগ্রামের মহকুমাশাসককে লিখিত একটি চিঠির ছত্রে-ছত্রে ছড়িয়ে আছে কবির অসহায়তার আর্তি। একটা সিস্টেম তাঁর 'স্টিক টু দ্য স্টেম' থাকাকে নিয়ে খেলছে, খেলতে-খেলতে খেলেই চলেছে।...[২২৪]

বাবা-মা'র মৃত্যুর পর আরও একা, আরও ফাঁকা বিনয় মজুমদারের কবিতা ছাপানো ততদিনে বন্ধ করে দিয়েছেন কোলকাতার প্রকাশকেরা। আর নির্ভার মন ও নির্মেদ সমঝোতায় সমস্ত আলোকবৃত্তের বাইরে চলে চলেছেন কবি বিনয়। ঠিক সেই সময়েই জেলা-মফস্বলের তরুণ কিছু কবি বিনয়ের বীতপ্রীতির ব্যারিকেড ভেঙে ফুল হয়ে ফুটছিলেন।

‘আমাদের বাগানে’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন বনগাঁ কলেজের দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক মণি মণ্ডল মহাশয়। সম্পাদিত ‘পণ’ পত্রিকার জন্য বিনয়ের কবিতা চেয়ে বিনয়নিকটে এসেছিলেন মণিবাবু। সংক্ষিপ্তাকারে হলেও সেই প্রথম বিনয়ের একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবনীও তিনি নির্মাণ করেন। ‘আমাদের বাগানে’ গ্রন্থটির শেষে ‘বিনয় মজুমদার : জীবন ও জীবনী’ নামে মণি মণ্ডলকৃত সেই লেখাটি এবং বিনয়ের রচনার একটি ক্রমতালিকা সংযোজিত হয়েছিলো। গ্রন্থটি মণি মণ্ডলের বদান্যতায় প্রকাশ পেলেও প্রকাশিকা হিসেবে তাঁর স্ত্রী কল্পনা মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছাপানো রয়েছে। ‘আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব’-এ বিনয় স্বয়ং একথা জানিয়েছেন। আত্মপরিচয়ের উক্ত পর্বেই কবি-সাহিত্যিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিও অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন বিনয়। গ্রাম ঠাকুরনগর ও নাম বিনয়কে যাঁরা বিভুঁই মনে করেননি, দূর কোলকাতা থেকে যাঁরা সুযোগ পেলেই চলে আসতেন কবির কাছে, তাঁদের মধ্যে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। কবিতা-কাব্যতত্ত্ব নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা চলতো, আর পরের পর বেরিয়ে যেতো ট্রেন। তাঁর ‘আত্মবর্গ’ পত্রিকায় ‘আমার ছন্দ’ শিরোনামে বিনয় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে ডায়াগ্রামের মতো কিছু ছবি ছিলো। অফসেট-ডি.টি.পি.-র আমল তখন নয়। তা সত্ত্বেও সেই চিত্রগুলি সযত্ন শ্রমসাধনায় ছাপিয়েছিলেন রঞ্জনবাবু।

কাছাকাছি সময়েই ধূর্জটি চন্দের প্রকাশনায় ‘আমি এই সভায়’ (বাংলা ১লা মাঘ ১৩৯১) নামে বিনয়ের আরও একটি কবিতার বই প্রকাশ পেলো। এরপর থেকে আর কোনদিনই কবিতা প্রকাশের ব্যাপারে বিনয়কে শহুরে কারও মুখাপেক্ষী হতে হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংলগ্ন অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার, উন্নয়নও ঘটেছে। বিনয়কে ঘিরে সাহিত্যানুরাগী তরুণদের যে জনসংঘটি গড়ে উঠেছিলো, কার্যত তাঁরাই নিজ দায়িত্বে, অর্থকরী পরিপোষকতায় শুধুমাত্র কবিকে ভালোবেসে তাঁর পরবর্তী বইগুলি প্রকাশ করে করে গিয়েছে। দেবদুলাল মিস্ত্রি ওরফে কবি তীর্থঙ্কর মৈত্র, অমলেন্দু বিশ্বাস, বৈদ্যনাথ দলপতি প্রমুখ ‘বিনয় পরিমণ্ডল’ নামের একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। কয়েকটি সংখ্যা এই নামে আলো দেখার পর নাম বললে হলো ‘নৌকো’। এঁদের উদ্যম ও আগ্রহেই দে’জ-এর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কবিতার সিরিজে বিনয় মজুমদারের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮১ খ্রিঃ-র এপ্রিল মাসে রূপ পেলো বহু কাঙ্খিত বিনয়ের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ সংকলনটি। বিনয় বলছেন— “তখনো আমার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইখানা বেরোয়নি। গোবরডাঙ্গার কবি সন্দীপ মুখোপাধ্যায় বললো ‘দাদা, আমরা তরুণ কবিরা অনুরোধ করবো দে’জ পাবলিশিং-এর মালিককে যাতে তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করেন।’ তরুণ কবিরা সত্যই অনুরোধ করেছিলো, এবং তার ফলে আমার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইখানি বেরোয়। ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইয়ের প্রথম মুদ্রণের প্রুফ আমি নিজেই দেখেছিলাম। দে’জ পাবলিশিং-এর মালিক সুধাংশুশেখর দে মুখে মুখেই আমার সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। কোনো

লিখিত চুক্তি হয়নি। সুধাংশুশেখর দে মশায় শুধু জিজ্ঞাসা করলেন 'কত পারসেন্ট রয়্যালটি চাই?' আমি বললাম পনেরো পারসেন্ট। ব্যাস।[২২৫] কিন্তু, বিনয়ের প্রতিটি শুভ মুহূর্তই যে নিয়তির করাতদাঁতে কাটা। 'ফিরে এসো, চাকা'-র হিরণ্ময় সৃষ্টিপর্ব থমকেছিলো মানসিক বিক্ষেপে। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বিষয়ক তুমুল হৈ-হল্লাও '৮৬-তে আবারও বিনয়ের গুরুতর অসুস্থতার সঙ্গেই মিলিয়ে এলো।

বিনয়-সংকলক শ্রী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্মৃতিচারণা থেকে বাবা-মা'র মৃত্যুর আগের ও পরের সময়ে বিনয়ের মানসিক অবস্থার ফারাকটি বুঝে নেওয়া যায়। তাঁর কথায়— "...আমি যখন ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে প্রথম তাঁর সঙ্গে দ্যাখা করতে যাই , তখন তিনি অনেকটাই সুস্থ, অনেক স্বাভাবিক। তাঁর বাড়ির বিশাল বাগানে ব'সে তিনি অনেকক্ষণ গল্প করছিলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর বেশবাস ছিলো পরিষ্কার, চুল যত্নে আঁচড়ানো, পরিপাটি; কথাবার্তা স্বাভাবিক। শুধু তাঁর ঠোঁট, হাত ও পা ভীষণভাবে কাঁপছিলো। কম বয়সের প্রগল্‌ভতায় তাঁকে কিছু অসংযত প্রশ্নও করেছিলাম। তিনি কিন্তু উত্তেজিত হননি। কোনোরকম উত্তেজনার কোনো চিহ্নও সেদিন তাঁর মধ্যে ছিলো না। আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ এই কবি সৌজন্য, স্নেহ ও আন্তরিকতায় আমাদের ভরিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর ১৯৮৬ সালে গিয়ে দেখলাম সম্পূর্ণ বিপরীতচিত্র। মা ও বাবা দুজনেই মরে যাবার ফলে বিনয় তখন সম্পূর্ণ একা, ভীষণরকম অসুস্থ এবং সম্পূর্ণভাবেই পরিচর্যাহীন। আক্ষরিক অর্থেই পথের ভিখিরির মতো তিনি তখন তাঁর গ্রাম শিমুলপুরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গ্রামের এক পথেই তঁকে আবিষ্কার করলাম। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী বিনয় আমাকে দ্যাখামাত্র চিনতে পারলেন। ধুলোকাদা মাখা খালি পা, ছিন্ন, মলিন ও অপ্রতুল বেশবাস, মাথা ও মুখভর্তি বড়ো বড়ো চুল-দাড়ির জঙ্গলে আমার পরিচিত বিনয় মজুমদারকে আর প্রায় চেনাই যাচ্ছিলো না।..."[২২৬]

বিনয় মজুমদারের বিধ্বস্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করে তরুণবাবু 'আজকাল' পত্রিকার 'প্রিয় সম্পাদক' কলামে শিখর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি চিঠি লিখেছিলেন। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এজরা ওয়ার্ডের উনিশ নম্বর বেডে ভর্তি হন বিনয়। পাঁচশো টাকা মাসোহারাও বরাদ্দ হয় তাঁর নামে। ২০০৮ সালে মুদ্রিত অনিলবরণের রোমন্থনধর্মী একটি লেখায় সেই দিনগুলিকে ছুঁতে পাওয়া যাচ্ছে— "আর আমরা পরিবারের সবাই জানি সরকার সর্বদা বইনয় সম্পর্কে সজাগ। সেই ১৯৮৬তে আমি যখন মাসাধিক কাল শয্যাশায়ী থাকার পর পি.জি. হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছি এবং ফলে অনেক দিন বিনয়ের দিকে নজর দিতে না পারার দরুন ও

অসুবিধায় পড়েছে তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু মশাই এর নির্দেশে আধিকারিকেরা বিনয়কে বাড়ি থেকে নিয়ে এজরায় ভর্তি করে দেন। পরবর্তীকালে বিনয়ের জন্য এজরাতে মনে হত সিত নির্দিষ্টই আছে।... যখন... আমি বিনয়কে নিয়ে এজরায় গেছি— সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি হতে কোন অসুবিধাই হয়নি। এবারের এই শেষ অসুস্থতার সময়েও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে পুংখানুপুংখ খোঁজ-খবর নিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি তাঁর বিনয়ের প্রতি ভালবাসাও...বিনয়ের অসুস্থতার সময়ে জানিয়েছেন। তাই আমার মনে এও হয়েছিল সরকারি হাসপাতালেই বিনয়ের চিকিৎসা ভাল হবে।"[২২৭]

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বলতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সাহিত্যপ্রাণ এই মানুষটি জ্যোতি বসু-র মন্ত্রিসভার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। কতকটা তাঁর ব্যক্তিক ইচ্ছেয় বিনয় মজুমদারের চিকিৎসার ভার অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্তকে দেওয়া হয়েছিলো। সরকারি হাসপাতালে ইলেকট্রিক শক থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয় কবিকে, কবি যার পক্ষপাতী কখনও ছিলেন না। এ সমস্তই তাঁকে মানসিক রোগী সাব্যস্ত করে উপেক্ষণীয় প্রতিপাদন করবার প্রয়াস বলে তাঁর মনে হতো। একটি কবিতায়[২২৮] তিনি তাঁর বাড়িতে জন্মদিন পালন বন্ধ করে দেওয়ার কারণ হিসেবে যন্ত্রণার খতিয়ান, ধারাবাহিকী দাখিল করেছেন। তাঁকে কতবার মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এসব সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে নাড়াঘাঁটা তাঁকে পীড়া দিতো। তবু কেউই জানতো না চাঁদে জল আছে, চাঁদ কাঁদে! ক্রমশ নিজের বৃত্ত সংকুচিত করে আনছেন তিনি। অথচ একদা ঠাকুরনগর রেলস্টেশনের বুক স্টলের মালিক রমণ দে-র কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে— "জীবনে খুব কমই আমি নিমন্ত্রণ বাড়িতে খেতে গেছি। এখন আমার কোনো বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে ইচ্ছে করে।"[২২৯] এ কি শব্দের গ্রন্থনা না ব্যথার বন্ধনী?...

মোট আঠারো বার ইলেকট্রিক শকের অমানবিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিলো তাঁকে। লুম্বিনী পার্ক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় একবার নাকি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে যেতে চেয়েছিলেন একবার। পুলিশি সহায়তায় তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিলো। সে যাত্রায় তাঁকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো এমন জনশ্রুতিও শোনা যায়। চিকিৎসার প্রতি বিনয়ের আতঙ্ক, হিংস্রতা উল্টে দিন-দিন বেড়েছে। 'সানন্দা' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভাস রায়চৌধুরীর লেখা 'কেউ বলে পাগল' নামের নিবন্ধ পড়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কবি। 'মেথর বিনয়দা' নামক একটি কবিতার নামকরণও আহত করেছিলো তাঁকে। একরাশ অভিমানে বিনয় মজুমদারকে বলতে হয়েছে— "ভারতবর্ষে আমাকে সাতবার পাগলাগারদে পোরা হয়েছে। অনেকেই তো পাগলাগারদে ছিলেন। তাঁদের জীবনীতে তা লেখা হয় না। আর আমার জীবনী লিখতে গেলে প্রথম বাক্যই লেখে— 'গোবরা মানসিক হাসপাতলে ছিলেন...'।

পাগলাগারদে আর কে কে ছিলেন শুনবে? লুম্বিনী পার্কে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক। এঁদের জীবনী যখন লেখে তখন তো এসব একথা লেখে না যে এঁরা পাগলাগারদে ছিলেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওই কথা— 'মানসিক হাসপাতালে ছিলেন...'।"[২৩০]

'৮৬-র অসুস্থতার সময় 'নৌকো'-র তরুণেরা, কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, বহু ছোট পত্রিকা ও কোলকাতার কিছু দৈনিক সকলের অবগতির স্বার্থে বিনয় অর্থাৎ তাঁর শারীরিক-মানসিক বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত জরুরি প্রচারকার্যে নামে। হাসপাতালের বেডে কিছু কবিতা, গল্প এসময়ে লিখেছিলেন বিনয়। তারপর বাড়ি। তারপর '৮৮-তে এজরা ওয়ার্ড, আবার বাড়ি। অতলান্ত দারিদ্র, অবহেলায় ক্রমনিমজ্জমান কবিকে দেখে অজয় নাগ-এর মতো কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন— বাবা-মা যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁকে দেখাশোনার অভাব হয়নি। তবে টাকাপয়সার অভাব নেই, পোস্ট অগিসে বেশ কিছু টাকা জমা আছে শোনা যায়; সেই টাকা বিনয়ের হাতে আসে না কেন?"[২৩১]

এই বিনয় ভঙ্গুরতার উত্তুঙ্গে আছেন। মোমবাতি, দেশলাই, বিড়ি, কাঠকয়লা ইত্যাদি নিয়ে ঘরময় (অর্থবহ) হিজিবিজি খেলা। এমনই একদিন শুধু অন্তর্বাস পরে বারান্দায় বসে ছিলেন অসুস্থ কবি। হঠাৎই কোনও এক পত্রিকার আলোকচিত্রী এসে সেই অবস্থাতেই কবির ছবি তুলতে গেলে ক্ষিপ্ত, অপমানিত কবি লাঠি হাতে, কারও কারওর মতে বর্শা হাতে তাঁকে রেলস্টেশন পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসেন। বিনয় বাড়ি ফেরার পথ ধরলে পিছন দিক থেকে সে ছবিই লেন্সবন্দি হয়ে পরদিন পত্রিকায় ছাপানো হলো। একটা মানুষ যাপন থেকে ছুটি নিলেও যে জীবন বলে তাঁর কিছু একটা থেকে যায়— নগরমননের এই ক্লীব জাতকেরা সামান্য রুচি ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতেও সেদিন অপারগ বড়। বরঞ্চ, 'নৌকো'-র তরুণ তুর্কিরা সীমায়িত সাধ্যের মধ্যেও স্বপ্নসাধকে পেলেছেন। বিভিন্ন মেলায় বিনয়-সংখ্যা বিলিয়েছেন, বিক্রি করেছেন ভালোবেসে, একঘরে বিনয়ের হয়ে কোনও জবাবকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েই। বিনয়ের তরফের অনেকরকম আবদার, অত্যাচার মেনে নিয়েও তাঁরা বিনয়ের দেখ্‌ভালে কসুর করেননি; হয়তো তা বুঝে যে— "খেজুরগাছে কাঁটা খেজুরগাছেরই সবচেয়ে বেশি কষ্ট।"[২৩২] ...

এর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে ফ্রান্সের পরমাণু-প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার নিউ জিল্যান্ডের অকল্যান্ড বন্দরে নোঙর-ফেলা 'গ্রিনপিস— রেইনবো ওয়্যারিয়র' জাহাজ ফরাসি গুপ্ত হামলায় ধ্বংস হয়েছে (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ খ্রিঃ), রাশিয়ার চের্নোবিল পরমাণু চুল্লিতে সংঘটিত হয়েছে ভয়াল দুর্ঘটনা (৬ মে, ১৯৮৬ খ্রিঃ), সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওল্‌ফ পাম আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রিঃ)— এই ধ্বংসমরণের

পাশাপাশি ভিনসেন্ট ভ্যান গখ-এর ছবি লন্ডনের একটি নিলামঘরে রেকর্ডমূল্যে বিক্রি হয়েছে (১৯৮৭ খ্রিঃ), বার্লিন ওয়াল-এর পতন ঘটেছে (১০ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিঃ)। আবার সলমন রুশদি-র উপর ইসলামি ফতোয়া জারি (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রিঃ), রাজধানী বেজিং-এর তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে ছাত্রযুবসমাজের জমায়েতে কমিউনিস্ট চিনা সরকারের নির্বিচার অভাবিত হানাদারি (৪ জুন, ১৯৮৯ খ্রিঃ), ২৭ বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার কারামুক্তি (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিঃ), দীর্ঘ লড়াইশেষে স্বাধীন দেশ হিসেবে নামিবিয়ার জন্ম (২১ মার্চ, ১৯৯০ খ্রিঃ), ইরাকের কুয়েত আক্রমণ (৮ আগস্ট, ১৯৯০ খ্রিঃ), উপসাগরীয় যুদ্ধশেষ (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ খ্রিঃ), রাশিয়ায় কমিউনিজ্‌মের অবসান, সোভিয়েত সাম্রাজ্যে প্রথম বিভাজন (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিঃ), বসনিয়ায় যুদ্ধের সূত্রপাত (৩০ আগস্ট, ১৯৯২ খ্রিঃ), সোমালিয়ায় যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সূচনা (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রিঃ), ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইনের মধ্যে শান্তি-চুক্তি স্থাপন (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিঃ), প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার শপথগ্রহণ (১০ মে, ১৯৯৪ খ্রিঃ), ফ্রান্সের পরমাণু-পরীক্ষার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিবাদপ্রস্তাব (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিঃ), মাদার টেরেসা-র মৃত্যু (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিঃ), প্রায় সার্ধশত বছরের ব্রিটিশ কলোনি হং কং-এর চিনে অন্তর্ভুক্তি (১ জুলাই, ১৯৯৭ খ্রিঃ), মহাকাশযান ‘পাথফাইন্ডার’ কর্তৃক লাল গ্রহ মঙ্গলের প্রথম চিত্রগ্রহণ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিঃ), ইউরো মুদ্রার প্রবর্তন (১ জানুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিঃ)— এ হলো বিশ শতকের শেষ দেড় দশকের পৃথিবী।[২৩৩]

ইত্যকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও ফের অনলসম্ভব। কেশপুর-গড়বেতা-ছোট আঙারিয়া-নান্নুরের রক্তক্ষয়ী ইতিবৃত্ত এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় কংগ্রেস দল ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১ জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিঃ) এ-রাজ্যের দশকশতক শেষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু বিনয় এসব কোনওকিছুর মধ্যেই তখন আর পড়েন না। যে সিসিফাস তিনি শপ্তপ্রস্তর ঠেলছেন, কোনও পরিবর্তনই আর তাঁর জন্য নয়। ’৯৪-য়ে তাঁর ‘এক পঙক্তির কবিতা’ বের হয়। তার কিছু আগে ১৯৯৩ খ্রিঃ-তে হলো অত্যন্ত জরুরি ও বহু অপেক্ষিত সেই প্রকাশনাটি— ‘কাব্যসমগ্র’ প্রথম খণ্ড। কবি ও কবিতার পরমায়ু প্রামাণ্য সংকলনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। একক প্রচেষ্টা ও যত্নে অগোছাল বিনয়কে ক্রম মিলিয়ে যিনি গুছিয়ে দিয়েছেন, সেই সংকলক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্তরকম প্লাবনশংসার ঊর্ধ্বলোক-নিবাসী। প্রকাশনা প্রতিভাস এই পর্যায়ে বিনয়ের বেশ আস্থাভাজন হয়ে ওঠে।[২৩৪]

পাশাপাশি অমলকুমার মণ্ডলের মতো স্বাধীন গবেষকের নাম উল্লেখ করতেই হয়, প্রাতিষ্ঠানিক

বদন্যতার বাইরে অবস্থান করেও যিনি সদ্যই লিখে উঠেছেন বিনয়ের পূর্ণাঙ্গ জীবনীটি। হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ডাঃ সুনীল পালের মতো কেউ কেউ তাঁর জন্য পার্থিব সহায়তার বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দ্রুত পড়ে আসা বেলায় অবোধ্য বেলাভূম ততদিনে পতনোন্মুখ। সময় কিংবা নিয়তির রাবণ তাঁর কবিতাকে হরণ করলে মুঠো মুঠো গহনালঙ্কার ফেলে ফেলে তা গিয়েছে (এগিয়েছে?) যেন— কবিতার বাক্‌প্রতিমা হয়ে এসেছে অতিমাত্রায় সরল। সহজ ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের পিছনে যুক্তির দর্শন সাজিয়ে অহরহ তিনি যা বুনে চলেছেন, তা না ধ্রুপদী, না সহজিয়া— ''...কোথাও-কোথাও আশ্চর্য উপমার সমাবেশ ঘটলেও, কাব্যগুণ সর্বত্র অক্ষুণ্ণ ছিল না।''[২৩৫] খ্যাত শহুরে প্রকাশনসংস্থাগুলিকে নতুন করে তাঁর বই প্রকাশে উৎসাহিত হতে আর দেখা যাচ্ছে না এই সময়ে। বরং একাধিক আঞ্চলিক পত্রিকা-প্রকাশনা তাঁকে অনর্গল প্রকাশ করে চলেছে। নানা মাপের, নানা মানের বই গোধূলিলগ্নের বিনয়কে জিইয়ে রেখেছে, রাখার প্রয়াস নিয়েছে বলা যায়। এ বিনয় সর্বান্তে ঈশ্বরী-মুক্ত, আর এই বিনতি একরকম নিরীশ্বর পৃথিবীর বুলেটিন! বিনয়ের তখনকার পরপর প্রকাশনাগুলি : 'এক পঙক্তির কবিতা' (জানুয়ারি, ১৯৮৮), 'বিনয় মজুমদারের ডায়েরি' (১৯৯৪), 'কাব্যসমগ্র' (প্রথম খণ্ড) (এপ্রিল, ১৯৯৩), 'আমাকেও মনে রেখো' (২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫), 'আমিই গণিতের শূন্য' (বইমেলা, ১৯৯৬), বিনয় মজুমদারের ছোটগল্প (১৯৯৮), 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে' (জানুয়ারি, ১৯৯৯), 'কবিতা বুঝিনি আমি' (জানুয়ারি, ২০০১), 'কাব্যসমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড) (এপ্রিল, ২০০২), 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' (২০০৩), 'ধূসর জীবনানন্দ' (২০০৩), 'সমান সমগ্র সীমাহীন' (২০০৪), 'শিমুলপুরে লেখা কবিতা' (২০০৫), 'পৃথিবীর মানচিত্র' (২০০৬), 'বিনোদিনী কুঠী' (২০০৬), 'ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য' (২০০৬), 'দুপুরে রচিত কবিতা' (২০০৬) ইত্যাদি। কবিতা তাঁর প্রতিভার প্রধান বাহন; তবু, এক বিশেষ বোধাক্রান্ত অবস্থার প্রলম্বন-ফসল তাঁর গল্প- ডায়েরি-প্রবন্ধগুলি, যেখানে অন্যতর গভীরতা, রস বা ধাঁধাবাজির বসত।

বিনয় লিখেছেন— ''আমি পনেরো হাজার কবিতা লিখেছি। কেন লিখেছি কেউ জানে না, আমিও জানি না। না লিখলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হতো না, আমার ক্ষতি হতো। লিখতে লিখতে বুঝেছি আমি কবিতা লিখতে জানি না। লিখতে লিখতে বুঝেছি কবিতা লিখলে দুঃখ ভোলা সম্ভব। কিন্তু দুঃখ ভুলে গেলে আর কবিতা লেখা যায় না।''[২৩৬] বিনয় দুঃখী হলেন, কেননা তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের ঠাঁই দেওয়া বিশ্বেশ্বর নামক দরিদ্র এক ফুল-ব্যবসায়ীর পরিবারকে স্থানীয় জটিলতায় উৎখাত হতে হলো। অথচ, এঁদের সাহচর্যে বিনয় কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। আসলে একটানা অসুস্থতা বা কবিজোনোচিত ঔদাস্যের সুবাদে তাঁর জীবন ও যাপনের 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' কে বা কারা যে তাঁর অজানিতেই হাতে তুলে নিয়েছে তা কবি

জেনে উঠতে পারলেন না! বিনয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছে-দাবি-চাহিদা ততদিনে আর চালিত নয়, পরিচালিত হচ্ছে। অসুস্থ হয়ে ফের ২০০২-য়ে ভর্তি হলেন বাঙ্গুর সাইকিয়াট্রিক ইন্সটিটিউটে। আর দুঃখ তাঁকে দুঃখী না করে আরবার রাজার রাজা করলো। 'আমরা দুজনে মিলে' নামের একটি প্রবাদপ্রতিম প্রেমের কবিতা (কবিতীর্থ পত্রিকার আশ্বিন ১৪০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত) যেন তাঁর আমরণ ঈশ্বরীসন্ধান কিংবা ঈশ্বরীসাধনা-র চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা। কবিতাটি :

"**আমরা দুজনে মিলে**

আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হলো।
তোমার গায়ের রঙ এখনো আগের মতো, তবে
তুমি আর হিন্দু নেই, খৃষ্টান হয়েছো।
তুমি আর আমি কিন্তু দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি।
আমার মাথার চুল যেরকম ছোট করে ছেটেছি এখন
তোমার মাথার চুলও সেইরূপ ছোট করে ছাটা,
ছবিতে দেখেছি আমি দৈনিক পত্রিকাতেই; যখন দুজনে
যুবতী ও যুবক ছিলাম
তখন কি জানতাম বুড়ো হয়ে যাব?
আশা করি বর্তমানে তোমার সন্তান নাতি ইত্যাদি হয়েছে।
আমার ঠিকানা আছে তোমার বাড়িতে,
তোমার ঠিকানা আছে আমার বাড়িতে,
চিঠি লিখব না।
আমরা একত্রে আছি বইয়ের পাতায়।"[২৩৭]

প্রসঙ্গত, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা তাত্ত্বিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সে-সময় কোলকাতা ঘুরে সদ্যই ফিরেছেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চা'-য় প্রকাশিত

সংবাদ অনুযায়ী কোনও এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি নাকি বিনয়কে চিহ্নিত করেছেন ‘বাংলার দান্তে’ বলে। প্রায় একই সময়ে তারা টিভির জন্য শৈবাল মিত্র ‘ফিরে এসো, চাকা’ নামে একটি কাহিনিচিত্র পরিবেশনা করেছিলেন। সেখানে বিনয় মজুমদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন কবি জয় গোস্বামী। সেখানে গায়ত্রী বিনয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এমন কিছু একটা দেখানো হয়েছিলো। আর তারই কি কাব্যিক রূপব্যাঞ্জনা কবিকথিত (...কৃত) গ্রন্থের গ্রন্থিটি!

১৯৯৫-য়ে ‘কবিতীর্থ সম্মান’ই বিনয়ের পাওয়া প্রথম পার্থিব পরস্কার। তারপর ’৯৬-তে ডিভিসি-র তরফে প্রদত্ত ‘সুধীন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি পুরস্কার’। একদা সুহৃদ সুনীল ঠাকুরনগরে এসে বিনয়ের হাতে পুরস্কারটি তুলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ‘কৃত্তিবাস পুরস্কার’ (২০০৪ খ্রিঃ), রবীন্দ্র পুরস্কার (২০০৫ খ্রিঃ) বা ‘সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার’ (২০০৫ খ্রিঃ)— কোনওটার জন্যই আর রাস্তার ধকল নিতে রাজি হননি কবি। কর্তৃপক্ষ উপযাজক হয়ে মানপত্র, স্মারক, অর্থমূল্য পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ঘোষণার পরপর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় বেশ জোরের সঙ্গেই কিন্তু পুরস্কার নিতে এমনকি দিল্লি যাওয়ার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছিলেন।[২৩৮] রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার খবর পেলে বিনয় নাকি দরজা বন্ধ করে নগ্ন হয়ে শুয়ে ছিলেন খাটে। এ কি কবিতার বাণিজ্যিকতার বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদী পাতার পোশাক? আমরা পড়তে পারি না। কথায়-কথায় নিজেকে ‘বিনয় অবতার’, ‘বিনয় ভাঁড়’ বলে কৌতুক করতেন কেন যে! হয়তো, ‘‘একটা বয়েস পেরিয়ে গেলে কোনওকিছুই দাঁড়ায় না’’[২৩৯], তাই। কবি ও জীবনানন্দ-গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ-র সঙ্গে যৌথভাবে রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার পর টিপ্পনী কেটেছিলেন এই বলে যে, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন ডাক্তার এবার একযোগে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে! উল্লেখ্য, ভূমেন্দ্র গুহ পেশায় নামধন্য চিকিৎসক— ডাঃ বি. এন. গুহরায় নামে তাঁর সমধিক পরিচিতি। ভারতের প্রথম সফল ‘ওপেন হার্ট সার্জারি’-র মেডিক্যাল টিমের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি।... সে যাইহোক, পুরস্কার-প্রদান অনুষ্ঠানে তখন পশ্চিমবঙ্গের কবিতামোদী মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় ‘ফিরে এসো, চাকা’-কে নির্বিকল্প ভেবে ভাবিত করলে কবিকে ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা মাত্রা পায়। তিনি নিজে উপযাজক হয়ে কবির সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন। বিপরীতে অশক্ত বিনয়ের জবাবনামাটি ছিলো কিন্তু আশ্চর্য রকমের নিরাসক্ত।[২৪০]

শিবরাম-ভক্ত বিনয়[২৪১], ব্যাডমিন্টন-ভলিবল স্পোর্টসম্যান বিনয়[২৪২] একবার ‘ফিরে এসো, চাকা’ লিখে ওঠবার পর আর যে কখনও লিখে সুখ পেলেন না কিংবা একদা পার্থিব হাসিখেলায় গান গেয়ে যে শেষমেশ নিজেনিজেই নিজেকেই ভুলে গেলেন— এমত পরিণতির জন্য কিছু ‘হাঙর’-কে দায়ী করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। অবধারিতভাবেই এ-হাঙর

জীবনানন্দের 'সমারূঢ়'[২৪৩]-র উল্লেখপ্রতীক। বিনয় স্পষ্টত বলছেন— "হাঙর মানে মনস্তত্ত্ববিদগণ, হাঙর মানে ডাক্তারগণ, হাঙর মানে পুলিশগণ, হাঙর মানে মন্ত্রিগণ, হাঙর মানে পুরোহিতগণ। এইসব হাঙরদের পাল্লায় পড়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়।"[২৪৪] 'গ্রন্থি' নামের একটি পত্রিকায় বিনয় "আমার চাকরি টিকলো না রাশিয়ান ভাষা শিক্ষা করে ওই ভাষা থেকে, নানা লেখা অনুবাদ করার কারণে।" জানিয়েছেন বলে 'অশ্বিনী তারার কবি' গ্রন্থে অমলকুমার মণ্ডল উদ্ধৃত করেছেন।[২৪৫] রুশভাষা ও কমিউনিজ্‌ম সংশ্লিষ্ট আর সে-কারণে ব্রিটিশপ্রণীত ভারতীয় কংগ্রেস তাঁর উপর বজ্রনির্ঘোষ শানিয়েছিলো কিনা, তা ভিন্ন অন্বেষণের বিষয়। কিন্তু, ব্রিটিশ-অধীন দশকগুলিতে বাংলায় কবিতার বদলে কবিতা-রাজনীতি সংঘটিত হতো বলেই তিনি চেতনাবচেতনে মনে করেছেন— "...বৃটিশ গভর্নমেন্টের আমলে যত বাঙালী কবি ছিল সবাই ইংরাজীর অধ্যাপক। বৃটিশ গভর্নমেন্ট এদের ছাড়া কাউকে কবি হতে দেয়নি। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী এঁরা ইংরাজীর অধ্যাপক।"[২৪৬]

কিন্তু জীবন-ক্যালেন্ডারের শেষদিককার তারিখগুলিতে অথর্ব, অক্ষম, প্রায় চলচ্ছক্তিরহিত বিনয় নিজেই যে কবিতাক্যাম্পাসে কবিতা-রাজনীতির জন্মের সহায়ক হয়ে পড়লেন। বিশুদ্ধ স্তাবকতা এই বিনয়-ব্যবসার মূলধন! রচনা ও পরিমার্জনার রাশ তাঁর হাতে আর নেই তখন। মনে পড়ছে, প্রয়াণের সামান্য কিছু আগে (অক্টোবর, '০৬) বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন তাঁর বেডে, বালিশের পাশে একটি না-লেখা খাতা পড়ে থাকতে দেখেছি— শিরোনাম : 'বনগাঁ হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ'। হস্তাক্ষর অবশ্যই বিনয়ের নয়। তাঁকে ঘিরে থাকা তীর্থঙ্কর মৈত্র, রমন, সুকৃতি, শিবেন, বনগাঁ নাট্যচর্চা কেন্দ্রের অভয় চক্রবর্তী, দুর্লভ দাস, ধৃতিমান বিশ্বাস, 'বাল্মীকি'-সম্পাদক লালমোহন বিশ্বাস কিংবা আর কারওর হবে। উল্লেখ্য, মাসকয়েক আগেই তাঁর 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' নামের একটি কবিতার বই 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারের বিলম্বিত স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই, ওই খাতাটির উদ্দেশ্য বা বিধেয় কোনওটাই সুমহান নয় বলেই আমাদের ধারণা। কেননা, জীবনান্তের দিকে এক পা বাড়িয়ে থাকা কবির পক্ষে কিছু লেখা তো দূরের কথা, একটি শব্দ উচ্চারণ করাটাও রীতিমতো বিপ্লব বলেই দীর্ঘক্ষণ তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিলো। হয়তো, আরও কিছুকাল এ-লোকে থাকলে বিনয়ের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা আরও একটি বাড়ত! এই নির্লজ্জ বিনয়-বকলম নিয়ে সুজিত সরকারের মতো কোনও কোনও বিনয়ভক্ত-কবি প্রকৃত কবির্মনীষীর কলম ধরেছিলেন।[২৪৭] আবার শেষ, সহসা জ্বলে ওঠা কিছু কবিতা, ঝলসে ওঠা গণিতের সূত্র, উপপাদ্য তাঁর অজ্ঞাতেই বেহাত হয়ে গিয়েছে, এমন সম্ভাবনাও কিন্তু ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।...

বিনয়ের অমূলক সন্দেহ প্রকাশ ও তজ্জনিত দূরত্বসৃষ্টির সময়টুকু বাদ দিলে বুচিই নতুন শতক-সহস্রক থেকে আবার খাবার রেঁধে বেড়ে কবির নিরালায় পৌঁছে দিতেন। মায় সন্ধেয় হেরিকেন জ্বালিয়ে দেবার দায়িত্বভারও ছিলো তাঁরই। কবিকে দেখভালের বিনিময়ে তিনবেলা খাবার আর নগদ সাড়ে সাতশ' (৭৫০/-) টাকার মতো হাতে পেতেন। আবার কবিজীবনের শেষ দু'টো মাস বুচি ছাড়াও মাধবী পারসি নামে আরও এক ভদ্রমহিলার বিশেষ তত্ত্বাবধানে কেটেছে। কবির লাগামহীন ধুমপানের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিলেন তিনি। বিনয়ের শেষের সে-দিনটি (১১ ডিসেম্বর, '০৬) মাধবীর বর্ণনা ও কবির শেষ জীবনের সহচর তরুণ কবি সুকৃতি শিকদারের অনুলিখন থেকে যেমন জানা যাচ্ছে— "শেষ দিন— অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকালে ওনার বাড়ি পৌঁছে গেলাম। আগের দিন নেয়া হয়নি— আজ ওনাকে কোনো হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোমে ভর্তি করার কথা। কিছুদিন ধরেই দু-পায়ে আর কোনো জোর ছিল না। কাকুকে ধরে ধরে এনে চেয়ারে বসালাম। স্টেশন থেকে চা এনে খাওয়ালাম। শেষ ছয়-সাত দিন নীচের চোয়াল শক্ত হয়ে গেছিল। কথা বলতে পারছিলেন না।

"এই দিন চা খাওয়ার পরে বেশ একটা মৃদু হাসলেন। হেসেই জিজ্ঞসা করলেন 'কে মাধু? মাধু না কি?' হ্যাঁ, কাকু চিনতে পারছ না, নাকি। ওনার অসহায় মুখে একটা হাসি হাসি ভাব তখনও ঝুলে আছে। তারপর জিজ্ঞসা করলেন, "সুকৃতি এসেছিল নাকি? ও যে বলেছিল ১০ ডিসেম্বর পরীক্ষা হয়ে গেলে পরদিন সকালে আসবে। সকাল বেলায়-ই আসবে বলেছিল।

"কাকু জানতে চাইছিলেন ওনার দাদা কখন আসবে। আমি বললাম সময় হলেই এসে পড়বে। চেয়ারে বসিয়ে গায়ে কম্বলটা ঠিক করে দিচ্ছিলাম। তখন বুচিদি দুধ নিয়ে এলেন। কাকুর কাত হয়ে পড়া মাথাটা বাঁহাতে সোজা করে ধরে আমি কাকুকে গ্লাসের দুধ খাওয়াচ্ছিলাম। বুচিদি তখন বলছিল, 'কাকু আর একটু পরেই তো আপনাকে সবাই হসপিটালে নিয়ে যাবে। আপনি দুধটা খেলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।' আমি দুধটা পুরো খাইয়ে দিলাম। একটু পরেই, আমার কেমন যেন মনে হলো, হাসপাতালে যাওয়ার কথা শুনে আতঙ্কেই হবে হয়তো— হঠাৎ একটা টান উঠল। বড় বড় নিশ্বাস নিতে শুরু করলেন। আমি ছুটে গিয়ে বিষ্ণু কাকু-কে বললাম, শিবেনদা, রমনদাকে নিয়ে আপনিও তাড়াতাড়ি আসুন আমার ঠিক ভালো ঠেকছে না। ফিরে এসে দেখি, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, টানও বেড়ে গেছে খুব। পাশের বাড়ি থেকে বাবুও বেরিয়ে এসেছেন। কাকুর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম— কষ্ট হচ্ছে? উনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন, বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন ছাড়ছিলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম আমি। ইতিমধ্যে বিষ্ণুকাকু এলেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে এখানকার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা হল। তারপর হঠাৎ শ্বাস থেমে গেল। ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের মতো কাকুর চোখের পাতা বুজে এল। তখন সকাল ৯.৪০।"[২৪৮]

বাহাত্তর (৭২) বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত জীবিতমৃত এক কবি কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বয়ংকৃত এক ব্যথা, নাড়ি ও নারীর প্রতি অব্‌সেশন (obsession) বা ফিক্সেশন (fixation) দিনদিন যাঁকে প্রক্ষিপ্ত করেছিলো। "রমন, তুমি আমার মতন এরকম জীবন যাপন করো না। বিয়ে করো...জীবনে স্থিতি আসবে, সুখী হবে। নতুবা শেষ বয়সটা দুর্বিষহ মনে হবে।"[২৪৯] অথবা "...আমি ফের জন্মাব। মানুষেরা গাছেরও বিয়ে অথচ আমাকে বিয়ে দিল না মানুষেরা... মাধু পরের জন্মে তুমি আমার মেয়ে হয়ে এসো— তোমাকে দোলনা কিনে দেব— ভালো করে সাজাব..."[২৫০] ইত্যাদিজাতীয় আক্ষেপনামা তো অনেক আগের 'ফিরে এসো, চাকা'-পর্বের ধ্রুপদী উচ্চারণেও[২৫১] এসেছে; যখন তাঁর হৃদিডুবান গান, বিধিপ্লাবন গাঙ— এসব ছিলো বা ছিলো না।

উঠোনকোণের যে অংশে বাবা-মা'র অন্ত্যেষ্টি হয়েছিলো, সেখানেই দাহকার্য সম্পাদনের বিনয়ের জীবদ্দশার শেষ ইচ্ছেটুকু বিনয়বৃত্তের কারও-কারওর আপত্তিতে পূরণ করা যায়নি। জীবিতের হাহারব শোনেনি, শোনেনা কেউ তো মৃতের বেদনা! তবু যাক, কবি তা জেনেই গিয়েছেন—

"আমি যদি কেঁদে উঠি অনির্বাণ আঘাতে আহত

তখনি সকলে ভাবে, শিশুদের মতোই আমার

ক্ষুধার উদ্রেক হলো, বেদনার কথা বোঝে না তো!"[২৫২]

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় মজুমদার, '৫ নং পত্র', পত্রাবলী, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৮৬

২. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৩

৩. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯৯

৪. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৬-১৫৭

৫. ঐ

৬. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, অক্টোবর '৯৯, পৃ. ১৯৯

৭. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৬

৮. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৮

৯. বিনয় মজুমদার, 'আমার ছোটবেলার কথা', (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩

১০. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৪

১১. বিনয় মজুমদার, '৮ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৮

বিনয়ের একটি কবিতায় তারাইল গ্রামের উল্লেখ মেলে।

দ্র. ঐ, 'গুচ্ছ কবিতা-৪', অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত বিনয় মজুমদার) ,শিবেন মজুমদার ও বৈদ্যনাথ দলপতি কর্তৃক সংগৃহীত ,(ইতিকথা পাবলিকেশন প্রথম প্রকাশ ,: জানুয়ারি ২০১৭ ,পরগনা ২৪ উত্তর ,চাঁদপাড়া ,শিমুলিয়াপাড়া , .পৃ ,৭৪৩২৪৫ ৭৫

[শারদীয়া সীমান্ত বাংলা: ১৪১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।]

১২. বিনয় মজুমদার, 'আমার ছোটবেলার কথা', (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩

প্রকৃতির এ-সমস্ত উপচার (যা তাঁর বহু উত্তীর্ণ কবিতারই অঙ্গসজ্জার সামগ্রী হয়েছে) নিয়ে বিনয়ের আবিষ্টতা যে কালাধিক কালের, তার সাক্ষ্য নিম্নলিখিত কবিতাটি— এও বিনয়ের অত্যুজ্জ্বল এক স্মৃতিস্মারক :

"বাবুই পাখির বাসা সঙ্গে নিয়ে একটি কিশোরী

চলেছিলো ব্রহ্মদেশ; কিন্তু সে শৈশবে সেই বাসাটি কখনো

ব্যবহার করিনি তো। তখনো শিথিল হয়ে ঝুলে থাকতাম।

তখনো সুদৃঢ় হয়ে ভালোভাবে দাঁড়াতে পারি না।

পৃথিবীতে সবই ছিলো, পর্দার আড়ালে ছিলো এলোকেশী চাঁদ,

প্রতিদিন নিয়মিত মেয়েরা পা ধুতো।

তবে আমি সে বয়সে ভালোভাবে ফুটতাম ঠিকই।

এরূপ সবারই হয়, সবার শৈশবই এ প্রকার।"

দ্র. ঐ; 'ছেলেবেলা', (কা.গ্র. 'বাল্মীকির কবিতা'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ৬০

এ যেন উৎপলকুমার বসু-র "ছিলো বটে সেই সব দিন।/ বুদ্ধি ছিল প্রতিবন্ধ,/ ছিল ফুলহীন পুষ্পগন্ধ—/ ঐতিহ্যে নবীন" উচ্চারণের মতোই কতকটা।

দ্র. উৎপলকুমার বসু; ১ সূচক কবিতা; (সুখ-দুঃখের সাথী); সুখ-দুঃখের সাথী; সপ্তর্ষি প্রকাশন; শ্রীরামপুর, হগলী; দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০০৬; পৃ. ১৩

১৩. বিনয় মজুমদার, 'আমার ছোটবেলার কথা', (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪

১৪. সমর কুমার মল্লিক, আধুনিক ভারতের রূপান্তর, রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭), ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ত্রয়োদশ প্রকাশ : মার্চ, ২০১৪-২০১৫, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৯৬

১৫. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London

১৬. বিনয় মজুমদার, 'আমার ছোটবেলার কথা', (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪

ছেলেবেলার এই ছবি শিশুমনের জন্য অবশ্যই প্রসাদরূপিনী নয়। অনেক পরে লেখা ছোট্ট একটি কবিতায় একটি দিন বিনয়ের স্মরণে আসছে—

"তখন আমার বয়স আট বছর।

এক ইংরেজ আমার বাঁ হাত ধ'রে

টেনে আমাকে শূন্যে তুলে ধ'রে

আমাকে একটি মিলিটারি ট্রাকে

তুলে দিয়েছিলো।"

দ্র. ঐ; 'একটি ঘটনা'; (কা.গ্র. 'এখন দ্বিতীয় শৈশবে'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৮৭

ত্রস্ত, যুদ্ধকালীন এই দিনগুলি নিশ্চিত বিনয়কে জীবন অবধি তাড়িয়ে ফিরেছে। নইলে তা মনে থাকবে কেন? মিলিটারি আর মিলিট্যান্ট-এর অন্তর্বর্তী পার্থক্য সে-বয়েসে বোঝে না কেউ, বোঝে বারুদের-বন্দুকের চেহারা-গন্ধটি!

১৭. বিনয় মজুমদার, 'আমার ছোটবেলার কথা', (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩

১৮. বিনয় মজুমদার, 'আমার লেখালেখি শুরুর কথা', অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৬

১৯. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৮

২০. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৬

২১. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৮

২২. ঐ

২৩. বিনয় মজুমদার, 'স্বাধীনতা সম্পর্কে আমি কিছুই ভাবি না', কামড়, (সম্পা.) ঋপণ আর্য, কুমড়া-কাশীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. অনুল্লেখিত

২৪. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৪

প্রথম কবিতা লেখার নাবাল-উচ্ছ্বাস পরিণত বয়েসে কবি অন্যখানেও ব্যক্ত করেছেন এইভাবে— "কৈশোর থেকেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি। প্রথম কবিতা যখন লিখি তখন বয়স তেরো বছর। নানা কারণে এই ঘটনাটি আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিলো এই : এক পালোয়ান বাজি ধ'রে একটি চলন্ত মোটর গাড়িকে টেনে পেছিয়ে নিয়ে এলো। এর পরেও আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতাম। কিন্তু ষোলো-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত কী লিখেছিলাম, কবিতাগুলির দশা কী হয়েছিলো কিছুই এখন আর মনে নেই।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৪

২৫. বিনয় মজুমদার, 'স্বাধীনতা সম্পর্কে আমি কিছুই ভাবি না', কামড়, (সম্পা.) ঋপণ আর্য, কুমড়া-কাশীপুর, উত্তর ২৪

পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. অনুল্লেখিত

২৬. বোধিসত্ত্ব রায়, 'সম্পাদকীয়', অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ২

২৭. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ১', কথোপকথনে— সমর তালুকদার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯০

২৮. ঐ, পৃ. ১৯১

২৯. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৮

৩০. বিনয় মজুমদার, 'কিছু পুরনো স্মৃতি', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৯

৩১. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৪

৩২. অজয় নাগ, 'বিনয় মজুমদার', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৪

৩৩. ঐ, পৃ. ১২

৩৪. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৫

৩৫. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৪

৩৬. অজয় নাগ, 'বিনয় মজুমদার', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১২-১৩

৩৭. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৫

৩৮. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৫

কিন্তু, একই স্মৃতির রেখা বিনয় অন্যত্র একটু অন্যভাবে বুনছেন— "এই সময়ে আমি প্রায় দৈনিকই একখানা কবিতার বই কিনতাম। তখন সবে সিগনেট বুক শপ খোলা হয়েছে কলেজ স্ট্রিটে। দিলীপ গুপ্ত মহাশয় তখন স্বয়ং দোকানে দাঁড়িয়ে বই বেচতেন। এবং আমি তখন হাফ্-প্যান্ট পরা। প্রায় দৈনিকই সিগনেট বুক শপে যেতাম। দিলীপবাবু আধুনিক বাংলা কবিতার বই দেখাতেন এবং আধুনিক বাংলা কবিতা সম্বন্ধে আমার কাছে বক্তৃতা দিতেন। দিলীপ গুপ্তর কাছ থেকেই আমি তৎকালীন বহু আধুনিক কবির নাম শুনি। প্রায় দৈনিকই আমি তৎকালীন আধুনিক কবিতার বই কিনতাম। এইভাবে দিলীপ গুপ্ত মহাশয়ের মাধ্যমে আমার পরিচয় হয় কল্লোল যুগের কবিবৃন্দের।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৫

৩৯. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৮

৪০. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৪-৫৫

৪১. অজয় নাগ, 'বিনয় মজুমদার', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ২৫

৪২. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৫

৪৩. বিনয় মজুমদার, 'কিছু পুরনো স্মৃতি', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৯

৪৪. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৫

৪৫. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৫-৭৬

৪৬. বিনয় মজুমদার, '৬ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৫

৪৭. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৮;

দ্র. অজয় নাগ, 'বিনয় মজুমদার', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৩

৪৮. বিনয় মজুমদার, '৭ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯২-৯৩

৪৯. ঐ, '৬ নং সাক্ষাৎকার', পৃ. ৮৮

৫০. বিনয় মজুমদারের মৃত্যুর কিছুদিন পরে সংকলিত 'দুপুরে রচিত কবিতা' নামক একটি কাব্যগ্রন্থে অশিরোনামা এই কবিতাটির সন্ধান দিয়েছেন সংকলক শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস মহাশয়।

দ্র. শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস, 'বিনয়ের নারী প্রসঙ্গে', দুপুরে রচিত কবিতা (বিনয় মজুমদার), তবু অভিমান, শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস কর্তৃক সংকলিত, প্রথম প্রকাশ : ১৩ জানুয়ারী, ২০০৭, পৃ. ৫

৫১. বিনয় মজুমদার, 'ঘ্রাণ', বিনয়ের মজুমদারের কবিতা, দুপুরে রচিত কবিতা, তবু অভিমান, শঙ্খশুভ্র দে বিশ্বাস

কর্তৃক সংকলিত, প্রথম প্রকাশ : ১৩ জানুয়ারী, ২০০৭ , পৃ. ৬

৫২. ঐ, '৬ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৮-৮৯

৫৩. ঐ, '৮ নং সাক্ষাৎকার', পৃ. ১০৪

৫৪. গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, 'বুঝতে চাই বিনয়ের সঙ্গে, নম্রতার সঙ্গে, আত্মসমীক্ষার সঙ্গে', (কথোপকথনে— চিন্ময় গুহ), বইয়ের দেশ, (সম্পা.) হর্ষ দত্ত, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০ সংখ্যা, পৃ. ১১৮

৫৫. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ১', কথোপকথনে— সমর তালুকদার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯২

৫৬. বিনয় মজুমদার, '২ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩০

৫৭. অনিলবরণ মজুমদার, 'হে আলেখ্য, প্রথম স্মরণ সংখ্যা' (১১ ডিসেম্বর প্রয়াত বিনয় মজুমদারের প্রথম স্মরণসভা উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্মরণিকা), সংকলক : অমলেন্দু বিশ্বাস, নৌকো প্রকাশনী, বিরাটি, ২০০৬, পৃ. ৯

৫৮. বিনয় মজুমদার, '৩ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪১-৪২

৫৯. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ১', সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : সমর তালুকদার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯১

৬০. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৯

৬১. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৭

৬২. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৫৯

সম্ভবত, ফেলে আসা প্রিয় অতীত ঘাঁটতে বসে বিহ্বল বিনয় সনতারিখ এলোমেলো করে ফেলেছেন। 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব' ও 'স্মৃতিকথা' নামক প্রবন্ধটির থেকে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হওয়ার সময়কাল ১৮৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে হবে। বরং 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব'-এ বিনয় এও বলছেন— "এই সময় কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কী ক'রে হয়েছিলো এখন আর তা মনে নেই।..."

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৭

কিন্তু, 'মুখোমুখি বিনয় মজুমদার' গ্রন্থে সংকলিত '৬ নং সাক্ষাৎকার'-এ বিনয়ের বয়ান এ'রকম— "...ছাত্রজীবনে বিমলচন্দ্র ঘোষ ছাড়া যে নামজাদা কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিনি হলেন বিষ্ণু দে। আমি তখন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তাম।...তখন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শতবর্ষ হচ্ছে। ঠিক করা হল একদিন কবিতা পাঠের আসর

হবে।...

"আমন্ত্রণপত্র নিয়ে গেলাম বিষ্ণু দে-র বাড়িতে। উনি বললেন, আমি তো কখনও কোনও সভায় তেমন যাই না, তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হয়ে যখন আমাকে ডেকেছ, তাহলে আমি যাব।

"বিষ্ণু দে মশাই গিয়েছিলেন। খুবই লম্বা ছিলেন। আমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করেছিলেন,..."

দ্র. ঐ, '৬ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৫

এই সাক্ষাৎকারটি অনুসরণ করলে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের আগেই বিনয়ের বিষ্ণুদর্শন হওয়ার কথা। তবে নিছক পরিচয় থেকে তা যে ঘনিষ্ঠতার দিকে এগিয়েছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, বিষ্ণুপুত্র জিষ্ণু দে বিনয়কে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন— বিনয়ের লেখা 'প্রসংগ : বিষ্ণু দে' নামক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ থেকে এমন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কোলকাতার কবিমহল অনাধুনিকতার অভিযোগ তুলে যখন বিনয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না, ঠিক সেই সময় 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় বিনয়ের কবিতাকে জায়গা দিয়েছিলেন প্রবীণ কবি। প্রতিদানে বিনয়ও তাঁর কৃতজ্ঞতা লুকোননি— "বিষ্ণুবাবুকে আমি চিনতাম এবং এর বাড়িতে আমি অনেকবার গেছি। বিষ্ণুবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় আমার লেখা গোটা কয়েক কবিতা বিষ্ণুবাবুই ছেপেছিলেন আমি যন্ত্রনির্মাতা, মাশিনোস্ত্রইতেল, মেকানিকাল ইন্‌জিনীয়ার হওয়া সত্ত্বেও।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'প্রসংগ : বিষ্ণু দে', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১১৮

৬৩. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৭

কিন্তু, জীবনাবসানের কিছুদিন আগে লিখিত একটি কবিতায় এই বিনয়ই আবার বলছেন— "...প্রত্যেক রবিবার আমি বিমলচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে যেতাম।/ বিমলচন্দ্র ঘোষ আমার কবিতা তাঁর 'বারোমাস' পত্রিকাতে/ গোটা কয়েক ছাপিয়েছিলেন। ব্যবসায়িক পত্রিকাতে এই আমার কবিতা প্রথম ছাপা হলো।..."

দ্র. ঐ, '৮ সংখ্যক কবিতা', ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ— কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা-২৩, পৃ. ২৭

সময়কালজনিত এই সমস্যা সংশুদ্ধির কোনও উপায়, উপায়ান্তর কবির মৃত্যুর পর সঙ্গত কারণেই আর নেই।

৬৪. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৫

৬৫. ঐ

৬৬. ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬

৬৭. ঐ, পৃ. ৫৬

৬৮. বিনয় মজুমদার, 'নকশাল আন্দোলনকে আমি অপছন্দ করতাম', তাং— ১২/১/২০০৬, কথোপকথনে : স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী ও পিনাক বণিক, অহর্নিশ, দশম বর্ষ চতুর্দশ সংকলন শীত ১৪১৩, শুভাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক ৫০৫/৮

অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১০

৬৯. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৬

৭০. 'হাংরি জেনেরেশান' শিরোনামের নিবন্ধে হাংরি ভাবনা নিয়ে বলতে গিয়ে শক্তি আদতে বলেছিলেন— "...বদহজমই হ'লো শিল্প। জীবন চিবিয়ে যতটুকু অখাদ্য, তাই হল পদ্য, গদ্য, ছবি ইত্যাদি। গু-গোবরের সামিল।" বিনয়ের সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই 'গায়ত্রীকে' নিয়ে এর পর শক্তি কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছিলেন বটে। কিন্তু বিনয়ের কবিতা বোঝাতে গিয়ে কোথাও গু-গোবর শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১০৯-১১৪

বিনয় মজুমদার পরবর্তীকালে আরও অনেকবার স্মৃতিবিভ্রমজনিত কারণেই হয়তো এ-ক ভুলের অবতারণা করেছেন। এই প্রসঙ্গটিতে তিনি এমনও বলেছেন যে, "শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'ফিরে এসো, চাকা'-র সমালোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি পত্রিকায়...প্রথম লিখল 'খুতকাতর সম্প্রদায়'। বলল আমি নাকি হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা।"

দ্র. ঐ, '৭ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৩

বস্তুত, এ-কথাও মনোভ্রমজাত। কেননা 'সম্প্রতি' পত্রিকার তৃতীয় সংকলনে (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) শক্তি 'গায়ত্রীকে'-র সমালোচনা করেছিলেন, আর 'গায়ত্রীকে'-র পরিবর্তিত রূপ 'ফিরে এসো, চাকা'-র সমালোচনা করেছিলেন 'সম্প্রতি' পত্রিকারই পঞ্চম সংকলন (১৩৭০ বঙ্গাব্দ)-এ। বিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে কখনওই শক্তি এমনতর বলেননি। তবে, 'হাংরি' সাহিত্যভাবনার সঙ্গে সাযুজ্যে বিনয়ের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে তিনি চেয়েছিলেন ঠিকই।

৭১. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৬

৭২. ঐ

৭৩. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা', গ্রন্থ পরিচয়, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ১৬৮

৭৪. বিনয় মজুমদার, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৬

৭৫. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৬

৭৬. ঐ, '১১ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ৩৬

৭৭. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৬

৭৮. ঐ, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৭

৭৯. ঐ, 'নকশাল আন্দোলনকে আমি অপছন্দ করতাম', তাং— ১২/১/২০০৬, কথোপকথনে : স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী ও পিনাক বণিক, অহর্নিশ, দশম বর্ষ চতুর্দশ সংকলন শীত ১৪১৩, শুভাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক ৫০৫/৮ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ১০

৮০. ঐ, '৩ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪২

৮১. ঐ

৮২. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৬০

৮৩. ঐ

৮৪. ঐ

৮৫. বিনয় মজুমদার, '৬ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৬

৮৬. ঐ

৮৭. ঐ, ৩ নং সাক্ষাৎকার, পৃ. ৪৮

৮৮. ঐ, ৬ নং সাক্ষাৎকার, পৃ. ৮৭

৮৯. ঐ, ৩ নং সাক্ষাৎকার, পৃ. ৩৮

৯০. ঐ, ৩ নং সাক্ষাৎকার, পৃ. ৪৬

৯১. বিনয় মজুমদার, 'গৌতমের জন্যে লিখিত', নৌকো সাহিত্য পত্র, বিশেষ কবিতা সংখ্যা, (সম্পা.) অমলেন্দু বিশ্বাস, ষষ্ঠ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৮, বিরাটি, পৃ. ৫-১৩

৯২. ঐ, 'একটি কবিতা' (অপ্রকাশিত), যামিনী, ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, (সম্পা.) পোশীয়া মণ্ডল, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১২ জানুয়ারী, পৃ. ৬

৯৩. নজরুল ইসলাম, 'আমার কৈফিয়ৎ', সঞ্চিতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, ঊনষষ্টিতম সংস্করণ— মাঘ, ১৪১০/ January, 2004, কলকাতা, পৃ. ৯০

৯৪. বিনয় মজুমদার, '৮ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৫-৯৬

৯৫. ঐ, 'আলাপচারিতা : ১', কথোপকথনে— সমর তালুকদার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

৯৬. ঐ, '৩ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪৭

৯৭. ঐ, '৭ নং সাক্ষাৎকার', পৃ. ৯৩

৯৮. সুব্রত রায়চৌধুরী, 'আধুনিক বাংলা কবিতা : সমুদ্রযাত্রার দিনলিপি', একালের কবিতা বিষয়ে ও শৈলীতে, প্রজ্ঞা বিকাশ, প্রথম প্রকাশ— বইমেলা, ২০০৯, কলকাতা-৯, পৃ. ১৫

৯৯. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৬১

১০০. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ২০০

১০১. ঐ, '২ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৩১

১০২. ঐ, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ২০০

১০৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছবির দেশে কবিতার দেশে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ— জুন ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৬১

১০৪. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ২০০

১০৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ৫

১০৬. ঐ, 'শুধু কবিতার জন্য', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ : মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৬

১০৭. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ১', কথোপকথনে— সমর তালুকদার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯৫

১০৮. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London

১০৯. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার', রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার এবং পুনরাবিষ্কার, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২১-২২

১১০. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬০

১১১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছবির দেশে কবিতার দেশে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ— জুন ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৯

১১২. বিনয় মজুমদার, '৩ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৪১

১১৩. অমলকুমার মণ্ডল, 'জীবনপঞ্জি', বিনয় মজুমদার অনুধ্যানে অনুভবে, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, কবিতীর্থ, ২য় সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৯, জুলাই ২০১২, পৃ. ২৬১

১১৪. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৭

১১৫. বিনয়ের ডায়েরির একটি উদ্ধৃত অংশ : "অনেক সুবিধা হয়ে গেছে শুধু এক ছন্দে আমার ছন্দেই শুধু লিখে কারণ অন্য যেকোনো ছন্দ শুনে বুঝি আমি আমার রচনা সেটা নয় তবে গানগুলি খুব ফ্যাসাদে ফেলেছে আমাকেও। আসল সত্যটি হচ্ছে— আমার ছন্দেই গান রচনা করা বা গাওয়া দুটো বড় অসম্ভব।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, '১১ চৈত্র, ১৩৯০ শিমূলপুর', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ৩৬

১১৬. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৭

১১৭. ঐ, পৃ. ৫৮

১১৮. ঐ, পৃ. ৫৮

১১৯. বিনয়ের আত্মদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নির্বাচিত অংশটিতে— "...তবে এটা ঠিক যে লক্ষ্য ক'রে প'ড়ে দেখতাম অন্যান্য তরুণ কবির লেখা থেকে আমার কবিতা ভিন্ন প্রকারের, এক রকম নয়। আমার কবিতা বেশ পুরনো ধাঁচের, সেগুলিকে ঠিক আধুনিক কবিতা বলা চলে না।"

দ্র. ঐ, পৃ. ৫৭

১২০. ঐ, পৃ. ৫৮

১২১. ঐ

১২২. ঐ, '৬ সংখ্যক কবিতা', ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ— কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা-২৩, পৃ. ২৩

১২৩. ঐ, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৭-৭৮

১২৪. 'গায়ত্রীকে' শীর্ষক পুস্তিকাটির নামপ্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার তাঁর কবিতা-সংকলক শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে লিখিত একটি পত্রে জানাচ্ছেন এমনই— "গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথমা হয়ে পাশ করেছিলো। সে-ই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বই-এর নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ১৫৩

১২৫. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৪

১২৬. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'প্রভাস'; বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; দে'জ পাবলিশিং; চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৩, আগস্ট ২০০৬; কলকাতা-৭৩; পৃ. ৩৮

১২৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'জরাসন্ধ', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঐ, দশম সংস্করণ : ১৪১০ ফাল্গুন, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, ঐ, পৃ. ১৭

১২৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'দুপুর'; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; ঐ; পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ : মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২; ঐ; পৃ. ১৯

১২৯. শঙ্খ ঘোষ, 'সঙ্ঘ', শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঐ, পরিবর্ধিত দে'জ দশম সংস্করণ : ভাদ্র ১৪১১। সেপ্টেম্বর ২০০৪, ঐ, পৃ. ৩৪

১৩০. ভাস্কর চক্রবর্তী, 'চৌ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমরা চারজন', ভাস্কর চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, ঐ, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৯। অগ্রহায়ণ ১৪০৬, ঐ, পৃ. ৯

১৩১. বিনয় মজুমদার; '৭ সংখ্যক কবিতা'; (কা.গ্র. 'গায়ত্রীকে'); কাব্যসমগ্র; ১ম খণ্ড; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২; পৃ. ৩৮

১৩২. ঐ, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা ১', কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ৮৫

বিনয়ের অঘ্রান-পরবর্তী একটি কবিতাতেও সম-মনোভাবের প্রক্ষেপ দেখছি—

"যেহেতু জীবনযাত্রা অন্তহীন সঙ্গমের মতো
সেহেতু পুলকরাগে উন্মাদিত ক'রে নিতে হয়
তোমাকে নানানভাবে সর্বদা উত্তাল ক'রে রাখি
সকল সম্পদ দিয়ে, যাতে এই রমণমালিকা
তীব্র উপভোগ্য হয়, যাতে তুমি আপ্যায়ন করো
অতীষ্ঠ ঈপ্সার মতো,..."

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ; 'দ্বৈত পারিবারিকতা'; (কা.গ্র. 'ঈশ্বরীর'); কাব্যসমগ্র; (দ্বিতীয় খণ্ড); ঐ; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২, ঐ, পৃ. ৩০

১৩৩. দ্র. জাকারিয়া শিরাজী, 'বিপ্রতীপ সংস্কৃতি, বীট প্রজন্ম ও অ্যালেন গীন্সবার্গ', কারুবাসনা (অন্যভাবনার ষাণ্মাসিক

সাহিত্য পত্রিকা), (সম্পা.) সব্যসাচী সেন, লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও বইমেলা ২০১০, দমদম, পৃ. ৭২;

দ্র. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'ছবির দেশে কবিতার দেশে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম মুদ্রণ— জুন ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৫৯

১৩৪. Bob Dylan, 'Blowin' in the Wind', BOB DYLAN 1962-2001 LYRICS, Simon & Schuster, First published in Great Britain by Simon & Schuster UK Ltd, 2004, This edition published by Simon & Schuster UK Ltd, 2006, London, P. N. 53

১৩৫. বিনয় মজুমদার, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ১৬১

১৩৬. ঐ, '২ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৭

১৩৭. ঐ, '..কবি বিনয় মজুমদারের অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার..', কথোপকথনে— বোধিসত্ত্ব রায়, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩৭

১৩৮. ঐ, '২ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৭

১৩৯. ঐ, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ১৬৩

১৪০. ঐ, পৃ. ১৬৫-১৬৬

১৪১. অন্যতম হাংরি শৈলেশ্বর ঘোষ-এর জবাবলিখন থেকে আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবগত হওয়া যাবে— "...চিন্তা, ভাবনা, ভাষা প্রয়োগ সবকটি ক্ষেত্রেই এটি বাংলা ভাষার একমাত্র সাহিত্য আন্দোলনই নয়, বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং সাহিত্যের নতুন পথ খননকারী আন্দোলনগুলির চেয়ে কোনোভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়ই, (এর সৃষ্টি আকস্মিক) আধুনিকতার হত্যাকারী বর্তমান পৃথিবীর অন্য দু-একটি আন্দোলনের চেয়ে কোনো কোনো চিন্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে। কেউ কেউ বিট জেনারেশনের কথা বলতে চান, কিন্তু তাঁরা বিট সাহিত্য এবং হাংরি সাহিত্য সঠিকভাবে অনুধাবন করেননি। বিটরা ধর্মীয় গোষ্ঠী, যদিও সেভাবে গোষ্ঠীবদ্ধতা তাদের মধ্যে ছিল না। হাংরিরা সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে (শুরুর প্রথম ১৫ বছরের মধ্যে বিষয়টির কোনো পরিবর্তন হয়নি) বিটরা যৌনতাকে ব্যবহার করেছে অস্ত্র হিসাবে, আমরা চেয়েছি যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ, যা স্বাধীনতাকে বড়ো স্পেসে নিয়ে যেতে পারে। বিটরা সমসাময়িক রাজনীতির সমালোচনা করেছে কিন্তু আমরা সবরকম ক্ষমতার ধ্বংস চেয়েছি। এবং নিজের ভিতর থেকে ক্ষমতার ভাষাকে ধ্বংস করার কথা বলেছি। বিটদের চেতনা দখল করেছিল 'জৈন বৌদ্ধধর্ম'। আমরা আমদের চেতনা জগৎ প্রভাব মুক্ত রেখে জীবনকে দেখতে চেয়েছি এবং সেভাবেই লেখায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি।..."

দ্র. শৈলেশ্বর ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের 'ক্ষুধার্ত'', হাংরি জেনারেশনের স্রষ্টাদের ক্ষুধার্ত সংকলন (সাতটি প্রতিষ্ঠানবিরোধী সংখ্যা), (সম্পা.) শৈলেশ্বর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭; কলকাতা-৭৩, পৃ. ৭

১৪২. সুবো আচার্য, 'স্বাধীন ও যথেচ্ছ রচনাসমূহ', ঐ, পৃ. ৪৭

১৪৩. বিনয় মজুমদার, 'আমি আর করবী কুসুম', কাব্যসমগ্র, ২য় খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ২২

১৪৪. (পুনর্মুদ্রিত) শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১১০-১১১

১৪৫. ঐ

১৪৬. বিনয় মজুমদার, 'বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা', কথোপকথনে— অজয় নাগ, বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৭৯

হাংরি জেনারেশন নিয়ে বিনয় আরেকটি জায়গায় বিস্তারিত বলছেন এরূপ— "শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'ফিরে এসো, চাকা'র সমালোচনা করতে গিয়ে সম্প্রতি পত্রিকায়...প্রথম লিখল 'খুতকাতর সম্প্রদায়'। বলল আমি নাকি হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা। এরপর হাংরি জেনারেশনের পত্রিকা বেরোল 'ক্ষুধার্ত'। হাংরি জেনারেশনের বুলেটিন। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটিই ছিল আমার। 'খেতে দেবে অন্ধকারে সকলের এই অভিলাষ' আমার পরে শক্তির কবিতা। তারপরে মলয় রায়চৌধুরী প্রমুখের কবিতা। এরপর আমি শক্তিকে লিখলাম— আ আমি প্রতিষ্ঠাতা নই। হাংরি জেনারেশন যখন শুরু হয়, যখন পত্রিকা বেরোয় তখন আমি দুর্গাপুরে চাকরি করি। ফলে আমার পক্ষে কোনও আন্দোলন শুরু করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমি নই শক্তি চট্টোপাধ্যায় হল হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা। পরে শক্তি হাংরি থেকে বিচ্যুত হল, আমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ফলে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি প্রতিষ্ঠা করেছে বলে দাবি করে। কথাটি মোটামুটি সত্যকথাই।..."ইত্যাদি।

দ্র. ঐ, '৭ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৩-৯৪

১৪৭. প্রভাতকুমার দাস, 'বাংলা কবিতা : একটি নিঃসঙ্গ উদাহরণ', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ৭১

১৪৮. বিনয় মজুমদার, '৮ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯৭

১৪৯. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৮-৫৯

১৫০. 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব' থেকে উদ্ধৃত বিনয়ের মন্তব্য— "...'ফিরে এসো, চাকা' কলকাতায় ফেরার আগেই ছাপা হয়ে গেছলো। ফলে আমি প্রুফ দেখতে পারিনি। অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেছলো। যেমন 'শুভ্র গান' এর জায়গায় ছাপা হয় 'শুভ গান'। অনেক জায়গায় শব্দও বাদ চ'লে গেছলো। আর, কবিতায় শব্দ বাদ যাওয়া মানেই তো ছন্দপতন।"

দ্র. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৫৯

১৫১. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬০

শক্তিকৃত বিনয়ের 'ফিরে এসো, চাকা' সমালোচনার টুকরো অংশ— "...আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক অনায়াসে উপলব্ধি করবেন এই উপমাগুলি কী রকম বিনয়ের নিজস্ব। ব্যক্তিগতভাবে আমি শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন, সুনীল এবং উৎপলের কবিতার অল্পবিস্তর পাঠক— তাঁদের প্রত্যেকের পৃথকভাবে কবিতার মনোস্থাপনা আমার কাছে পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা। বিনয়ের কবিতা পাঠ করে আমি সম্পূর্ণ অন্য এক বিপন্ন কবিত্বের আস্বাদ পাই এবং সেখানে তাঁর শেষতম ইচ্ছা 'চিরন্তন শিখরের বায়ু'।..."

দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১১৪

১৫২. দ্র. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ', কৃত্তিবাস পঞ্চাশ বছর নির্বাচিত সংকলন (১), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিংশ সংকলন, ১৯৬৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ— আগস্ট ২০০৩, পৃ. ২৬৩

১৫৩. দ্র. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ', কৃত্তিবাস সংকলন (২), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিংশ সংকলন, ১৯৬৫, প্যাপিরাস, প্রকাশ— ১৩৯৩ বৈশাখ ১, পৃ. ১৫৪

জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ হওয়া থেকে শুরু করে বিনয়ের কবিতা নিয়ে জ্যোতির্ময় দত্তের প্রবন্ধ লেখা এবং বিনয়কে দিয়ে তাঁর হলফনামা লেখানোর বিষয়ে বিনয় লিখেছেন— "একদিন তারাপদবাবু বললেন, 'আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। যাবেন তাঁর কাছে? কাছেই থাকে সে, বালিগঞ্জে। আমি হেঁটেই যাই।' প্রথম দিন বোধ হয় আমি যেতে রাজি হইনি। পরে আরেকদিন তিনি যখন বললেন তখন রাজি হলাম। হাজরা রোড ধ'রে সিধে পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম দুজনে। তারাপদবাবুর কাছে ছোটা আর হাঁটা প্রায় একই ব্যাপার। ফলে অল্প সময়েই পৌঁছে গেলাম। পরিচয় হলো জ্যোতির্ময় দত্তর সঙ্গে।

"জ্যোতিবাবু বললেন, 'আপনার কবিতা সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছি। সে-জন্য আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো। প্রবন্ধটি ছাপায় আপনার অমত নেই— এই কথাটি আপনাকে লিখে দিতে হবে।'

"এ-কথা আমি লিখে দিয়েছিলাম, তবে প্রথম সাক্ষাতের দিনে নয়, পরে একদিন। প্রবন্ধটি যাতে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেই চেষ্টাই করছিলেন জ্যোতিবাবু। কিন্তু অত দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপতে হলে ক্রমশ ক'রে ছাপতে হবে, এই হেতু সাগরময় ঘোষ মহাশয় ছাপতে রাজি হননি। এ-প্রবন্ধ অনেক পরে কৃত্তিবাস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬০-৬১

১৫৪. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ', কৃত্তিবাস সংকলন (২), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিংশ সংকলন, ১৯৬৫, প্যাপিরাস, প্রকাশ— ১৩৯৩ বৈশাখ ১, পৃ. ১৪০-১৪১-১৪২

১৫৫. দ্র. ঐ, 'বিনয়কে', যোগসূত্র পত্রিকা, (সম্পা.) বিনয় ঘোষ, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ২৯

জ্যোতির্ময় দত্তের সঙ্গে তাঁর 'স্টেটসম্যান হাউস'-এ প্রথম আলাপের বৃত্তান্তটি নিয়ে বিনয় মজুমদার যা স্মৃতিচারণা করেছেন, জ্যোতির্ময়ের স্মৃতিসূত্রের বিন্যাসটি তার চেয়ে কিঞ্চিৎ আলাদা। এমনকি, তারাপদ রায় তাঁকে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন বলে বিনয় বললেও, জ্যোতির সঙ্গে বিনয়ের প্রথম আলাপে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সঙ্গী ছিলেন বলেই জ্যোতির্ময়-জায়া মীনাক্ষী (সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু-র কন্যা)-র মনে পড়ছে। মীনাক্ষী লিখছেন— "বিনয় মজুমদারকে প্রথম দেখি ১৯৬৪ সালে। কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় একটা প্রবন্ধ (অথবা পুস্তক

সমালোচনা) লিখেছিলেন যাতে বিনয়ের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি ছিল। লেখাটি হয়তো 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের সমালোচনাও হতে পারে। ওই পঙ্‌ক্তিগুলি পটে মোহিত হয়ে গেলো জ্যোতি। পুরো বইটি পড়ার জন্য খুবই অস্থির। বইটি পড়ার জন্য এবং ওই অসাধারণ কবির সঙ্গে আলাপ করার জন্যও। চারদিকে খোঁজ খোঁজ, বিনয়কে কোথায় পাওয়া যায়। খুব সম্ভব শক্তিই একদিন মধ্যরাত্রে বিনয়কে নিয়ে চলে গিয়েছিল জ্যোতির অফিসে, স্টেটসম্যানে। তার আগেই 'ফিরে এসো, চাকা' সংগ্রহ ক'রে জ্যোতির পড়া হয়ে গেছে। তখন জ্যোতিকে প্রায়ই নাইট ডিউটি করতে হত। জ্যোতির কাছে শুনেছিলাম, ওদের পিছনে ছিল ঘন্টি হাতে রিক্সাওয়ালা, যে সারা শহর ঘুরে ভাড়া না পেয়ে ওদের পিছু পিছু সাহেবি খবরের কাগজের নিউজ রুমে ঢুকে এসেছিল। বিনয় নাকি বলেছিল, 'শুনলাম আপনি নাকি আমাকে খুঁজছেন?'"

দ্র. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৪

১৫৬. 'কিছু পুরনো স্মৃতি' নামক একটি ব্যক্তিগত লেখাতেও তাস খেলা নিয়ে বিনয়ের কিছু কথাবার্তা পাওয়া যাচ্ছে— "...সোমেশ মুখোপাধ্যায় বললো যে, শ্যামবাজারের 'থিটা বিটা' ক্লাব প্রত্যেক বছরই সারা বাংলা Contract ব্রীজ প্রতিযোগিতা করে। সোমেশের খুব ইচ্ছা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবো আমি ও সোমেশ। আমি রাজি হয়ে গেলাম। ব্রীজ খেলার দিন আমি এবং সোমেশ গেলাম খেলতে। সকাল নটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত একটানা খেলা।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'কিছু পুরনো স্মৃতি', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৯

১৫৭. মীনাক্ষীর কথায় বিনয়ের সেইসময়কার মনোবিকারের নমুনা মেলে— "...তখন বিনয় হিংস্র পাগল। বিশেষত জ্যোতিকে দেখলেই দাঁত কিড়মিড় ক'রে শাপপান্ত [শাপান্ত] করে। একদিন আমার কাছে আমার বাবা বুদ্ধদেব বসুর আমেরিকার ঠিকানা চাইলো। 'কেন, কী হবে?' 'উকিলের চিঠি পাঠাব। আমার কবিতা চুরি ক'রে বই ছাপিয়েছে।' আমাদের পরিবারের কাছে বিনয়ের অপরাধের সীমা নেই, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বিনয় মজুমদার নামক প্রতিভাধর ব্যক্তিটির প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি উবে গেল। আমার রাগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ব'লেও বিনয়ের রাগ ছিল, ও রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজদের পদলেহনকারী ব'লে গাল দিয়ে ডায়েরির পাতা ভরিয়ে ফেলেছে।"

দ্র. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৬

১৫৮. ঘন ঘন বিনয়ের এই ঈশ্বরী-দর্শন সম্পর্কে মীনাক্ষী লিখেছেন— "বিনয় মাঝে মাঝেই কোনো না কোনো মেয়েকে ওর 'ঈশ্বরী' বানিয়ে নিত। অজিতা চক্রবর্তী, ফুল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী এরকম অনেক। চাকা বোধহয় চক্রবর্তী থেকেই। এদের কাউকেই ও চিনতো না। মানুষ যেমন মূর্তি গড়ে পূজো [পুজো] করে, সেই মূর্তিকে কাপড় গয়না পরায়, দাঁত মাজায়, স্নান করায়, নাম দেয়, এও তেমনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা পুরুষ, বিনয়ের ঈশ্বরী নারী। কোনো বিশেষ রমণীর সঙ্গে এর সম্পর্ক খোঁজা হাস্যকর। তখন একটা গল্প চালু ছিল যে গায়ত্রীর ভক্তরা বেকার ল্যাবরেটরির পেছনে নিয়ে গিয়ে বিনয়কে মেরেছিল। মাথায় এমন মেরেছিল যে তারপর থেকেই ওর মাথার গোলমাল। এটা ভুল, কারণ পরে গায়ত্রীর সঙ্গে কথা ব'লে জেনেছি গায়ত্রী বিনয় বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না।..."

দ্র. ঐ, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৫

১৫৯. বিনয় মজুমদার, 'নিজের কবিতা প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার', (অনুলিখন) সুরসত্ত্ব রায়, অধরা মাধুরী, (সম্পা.)

বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৫৩

১৬০. দ্র. 'এই সংখ্যার লেখক', কৃত্তিবাস সংকলন (২), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, একবিংশ সংকলন, ১৯৬৫, প্যাপিরাস, প্রকাশ— ১৩৯৩ বৈশাখ ১, পৃ. ১৬২-১৬৩

১৬১. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৫

১৬২. ঐ

১৬৩. ঐ

১৬৪. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬২

১৬৫. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৬

১৬৬. নিশ্চয়ই স্মৃতির শত্রুতাবশত 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব'-এ উক্ত লেখাটি মে মাসে ছাপা হয়েছিলো বলে বিনয় মন্তব্য করেছেন। অসংক্ষেপিত ও অপরিবর্তিত সেই লেখাটি এরূপ—

POET'S CORNER

Benay Majumder, author of 'Phirey eso chaka' (Turn Again, O Wheel), has already, at 29, become a legend. It is hard to shift the facts from the myths about him. Was he really the mathematical prodigy that his friends claim he was? Did he really take a degree in engineering and if he did, what made him turn from technology to poetry? Some ascribe the shift is interest, probably taking some lines in his poems too literally, to an unhappy love affair.

He is supposed to have been offered five different technical jobs between 1957, the year he got his B.E. degree and 1960 the year he wrote the first poem of his book, it is not known whether he accepted all of them but it is certain he was unable to retain any for more than a few months. It is also certain that on July 27, 1961 he found himself in a mental home, a captive of warders, who the poet maintains, should have been put in straight jackerts instead of himself.

Regaining freedom after six months, Majumder plunged into a frenzy of creativity and after writing three poems a day, completed his book in 1963. And more certain than all this dates and facts is the incontestable truthfulness and beauty of his poetry.

After completing his book, all that fine frenzy spent (to quote Yeats), Benay Majumder relapsed into a long silence, broken fitfully by poems that are unsuccessful copies of his previous ones. He has now lost all interest in his poetry, he has sold the copy-right of his book and makes a wry face when his poems are praised. In a garage in South Calcutta that an admirer has rented for Majumder, we found the poet waiting for the knock of the postman announcing the acceptance by the scientific world of his solutions of algebraic enigmas that puzzled Einstein. Majumder may never be accepted by the world of science but he has already made his way into the history of Bengali literature.

দ্র. বিনয় মজুমদার, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৯৯-১০০

বিনয়ের কবি ও কারিগর সত্তার একত্র অধিবেশনটি নিয়ে লেখাটিতে ছদ্ম-বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে, কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ও তথ্যবিচ্যুতি চোখে পড়ে। 'ফিরে এসো, চাকা'-র 'ফিরে এসো'-র পর ',' চিহ্নটি 'Phirey eso chaka'-য় পড়েনি। আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিনয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'ফিরে এসো, চাকা' রচনা সমাপ্ত করেন বলে উল্লেখ থাকলেও বস্তুত তা নয়। 'ফিরে এসো, চাকা'-র শেষ কবিতাটি লিখিত হয়েছিলো ২৯ জুন, ১৯৬২।

দ্র. বিনয় মজুমদার, '২৯ জুন ১৯৬২', ফিরে এসো, চাকা, অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ— শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, পৃ. ৫৬

১৬৭. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬১

১৬৮. দ্র. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'বিনয় মজুমদার : কবিতার শহিদ', কৃত্তিবাস সংকলন (২), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিংশ সংকলন, ১৯৬৫, প্যাপিরাস, প্রকাশ— ১৩৯৩ বৈশাখ ১, পৃ. ১৫৪

১৬৯. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬২

১৭০. বিনয় মজুমদার, '৯ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১০৬

১৭১. ঐ, '৩ নং সাক্ষাৎকার', পৃ. ৬১

১৭২. ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৬

১৭৩. ঐ, '২ নং পত্র', পত্রাবলী, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, ঐ, পৃ. ৮২

১৭৪. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, ঐ, পৃ. ৬৩

১৭৫. ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় বলেছিলেন— "...বছর কুড়ি পরে চিঠি লিখলাম...যে, আমি যে কবিতার খাতাটা পাঠিয়েছিলাম সেটা কি আপনারা রেখেছেন নাকি ফেলে দিয়েছেন মশাই? ওরা লিখল যে, আমরা খুঁজে দেখছি, অপেক্ষা করুন। এই বলে ওয়ালি বলে এক ভদ্রলোক চিঠি দিলেন যে, আমরা সেটা লাইব্রেরিতে রেখে দিয়েছি। আগে নাম ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়াম, এখন সেটাকে ভেঙে বইয়ের যে অংশটা সেটাকে আলাদা করে শুধু একটা লাইব্রেরি করেছি, নাম দিয়েছি, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লাইব্রেরি এবং আমি ওয়ালি আপনাকে জানাচ্ছি যে— আপনি যে ভাষায় কবিতা লিখেছেন সেটা বাংলা ভাষার বই। আমরা বাংলা ভাষার ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি। কিছুদিন অপেক্ষা করুন। কিছুদিন পরে একখানা চিঠি এল। চিঠিতে লিখেছে, শ্রীমজুমদার বলে, আমাকে মিঃ মজুমদার না লিখে শ্রীমজুমদার বলে চিঠি লিখেছে ইংরেজি ভাষায়। বুঝলাম এ ইংরেজ তো বাংলা ভাষা জানে। সেই ইংরেজের নাম দেখলাম জি ডব্লিউ। লিখেছে যে— আছে। আপনার পাণ্ডুলিপিখানা আমরা রেখে দিয়েছি যত্ন করে। আমাদের লাইব্রেরিতে আছে। ক্যাটালগ নম্বর হচ্ছে পি-১৩ কিংবা পি-৩১। আমার সঠিক মনে নেই।"

দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) বিনয় মজুমদার, '৮ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ,

কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১০০-১০১

যে সংরক্ষণে বিন্দুমাত্র অর্থকরী লাভ-ক্ষতির ব্যাপার জড়িত নেই, সেখানেও এক বাঙালি কবির ভাগ্যে এই অনীহার বহর জুটতে দেখলে বড্ড চোখে লাগে, আঁতে লাগে, ধাক্কা লাগে। শিল্পপূজক ইংরেজের উলটোপিঠে শিল্পবেনে ও উদাসীন বাঙালির প্রতিষ্ঠা বোধহয় খুব শোভন ও সম্মানজনক নয়।

১৭৬. ঐ, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৩

১৭৭. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'চে গুয়েভারার প্রতি', রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা (বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী কবিতার সংকলন), (সম্পা.) অর্জুন গোস্বামী, রক্তকরবী, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৫, কলকাতা-৫৪, পৃ. ৪৭

১৭৮. একান্ত আত্মকথনে বিনয় লিখছেন— "যতদূর মনে পড়ে এই সময়েই কবি জ্যোতির্ময় দত্ত আমার লেখা 'ফিরে এসো, চাকা' বইখানি জ্যোতির্ময় দত্তর টাকা দিয়েই বার করেন। তারপরে আর আমার কোনো বই ছাপাতে আমাকে টাকা দিতে হয়নি। প্রকাশকদের টাকাতেই আমার সব বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে। এর মূলে আছেন, আমার কবিবন্ধু জ্যোতির্ময় দত্ত।"

বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৮

একটি সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্ময়-মীনাক্ষীর প্রতি সকৃতজ্ঞ বিনয়কে দেখি— "আমার কবিতা লিখতে বহু কষ্ট করতে হয়েছে। বহু অবহেলা সইতে হয়েছে। আমার বই কেউ ছাপত না। প্রথম ছাপল মীনাক্ষী দত্ত তাঁর মানে জ্যোতির্ময় দত্তর বউ অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুর মেয়ে— ১৯৬৮ সালে। টাকা দিয়েছে মীনাক্ষী দত্ত নিজে।"

ঐ, '৮ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১০১

আবার, আত্মপরিচয় অংশে একটি জায়গায় বিনয় বলছেন— "...গত তিরিশ বছর কীভাবে বেঁচে আছি, সে কথা না-লেখাই ভালো।...কবি জ্যোতির্ময় দত্ত পৃথিবীতে যদি জন্মগ্রহণ না করতেন তবে আমার কী হতো কে জানে।"

ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৮

১৭৯. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৬;

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৮

১৮০. ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৮

১৮১. জ্যোতির্ময়-পত্নী মীনাক্ষী দত্ত স্মৃতিদুয়ার উদ্‌ঘাটন করছেন— "একদিন সন্ধ্যায় আমার ভাই শুদ্ধশীল ও অমিয় বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত আমার বাড়িতে এসে দেখলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে, ভেতরে উন্মাদ বিনয়। আমার অনেক অত্যাচার ও আবদার হাসিমুখে চিরকাল সহ্য করেছেন হামদি বে। তিনিই জ্যোতিকে বুঝিয়ে রাজি

করালেন। ঠিক হল লুম্বিনি পার্কে দেওয়া হবে। এবং সকলেই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করবেন। ওর বাবাও টাকা পাঠাবেন। সমর সেন নিজে থেকে বললেন, 'আমিও টাকা দেবো।' লুম্বিনি পার্কের ডিরেক্টার ডঃ মৃণাল বড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। ব্যক্তিগতভাবে উনি বিনয়কে বিশেষরকম দেখাশোনা করতেন। জ্যোতি, সুবীর, অমিয় নিয়মিত তখন ওকে দেখতে যেত। সেই বিনয়ের হাসপাতাল যাওয়া শুরু। হাসপাতালে যাওয়া, কদিন ভালো থাকা, আবার হাসপাতাল।"

দ্র. মীনাক্ষী দত্ত, 'দীর্ঘদিন বিনয়ের সঙ্গে', অ্যালবাম থেকে কয়েকজন, প্রতিভাস, পরিমার্জিত প্রতিভাস সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা, ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ১৮৭

১৮২. বিনয় মজুমদার, '৪ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৭৬

১৮৩. ঐ, পৃ. ৭৭

১৮৪. ঐ, '২ নং সাক্ষাৎকার', পৃ. ২৮

১৮৫. ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৭

১৮৬. ঐ

১৮৭. ঐ, পৃ. ৬৯

১৮৮. অজয় নাগ, 'বিনয় মজুমদার', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ৩১

যদিও বিনয় নিজে একটি সাক্ষাৎকারে মদ্যপান নিয়ে বলেছেন— "ধরো মদের আড্ডায় গিয়ে বসেছি— সবাই লেখক, বন্ধুবান্ধব! আমাকে ধরে খেতেই হবে বলে এক ঢোক খাইয়ে দিল। সারা জীবন মিলে ১০/১৫ দিন মদ খেয়েছি। ১/১ দিন ১/১ ঢোক। "

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আলাপচারিতা : ২', কথোপকথনে— সুব্রত সরকার, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১৯৯

১৮৯. দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) জ্যোতির্ময় ঘোষ, 'কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি : তাঁদের কবিতা', 'উজ্জীবন ১', (সম্পা.) সুতপা মুখোপাধ্যায়, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১৪, কলকাতা, পৃ. ৩৬

১৯০. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৩

১৯১. ঐ, 'স্মৃতিকথা', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৮

১৯২. ঐ, '২ নং পত্র', পত্রাবলী, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৮২

১৯৩. ঐ, 'এই সব সত্য', কৃত্তিবাস সংকলন (২), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বাবিংশ সংকলন, মে ১৯৬৬, প্যাপিরাস, প্রকাশ— ১৩৯৩ বৈশাখ ১, পৃ. ১৯৯-২০০

১৯৪. দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) নরেশ গুহ, 'নরেশ গুহর চিঠি', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৯৬

১৯৫. আদত ব্যাখ্যার পাশ কাটিয়ে নিজস্ব ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে বিনয়কে অন্যক্ষেত্রেও দেখি। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'দিদিহারা' কবিতাটির "বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ,/ মাগো আমার শোলোকবলা কাজলা দিদি কই?" পংক্তিটি 'সম্পূর্ণতই নিসর্গবর্ণনামূলক' হলেও বিনয় বলছেন— "...বিশেষ প্রকারের psychological association হেতু বাঁশ এবং চাঁদের পরিবর্তে আমরা তাদের সগোত্রদ্বয়কে ভাবতে শুরু করি, অর্থাৎ বাঁশের পরিবর্তে বিপদজ্ঞাপক অবস্থা এবং চাঁদের পরিবর্তে রমণী।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ২১

কিন্তু কবিতায় ব্যবহৃত 'বাঁশ' ও 'চাঁদ'-কে কোনও অর্থপ্রদ প্রতীক মনে করার যথোচিত কারণ নেই বলেই কবিতাপাঠ-শেষে আমাদের প্রতীয়মান হবে। প্রাণপ্রিয় দিদির মৃত্যুকে ঘিরে না-বুঝ শিশুর অন্তরে ঘনীভূত শোককেই কবি ভাষা দিয়েছেন কেবল। ব্যক্তি বিনয়ের রমণীহীন দিনের অসহ পিস্টন প্রাবন্ধিক বিনয়ের লেখনীকে অসংযত নিয়ন্ত্রণ করেছে হয়তোবা।

১৯৬. রুশ ভাষাজ্ঞানের কল্যাণে তিনি যে ব্যবহৃত হয়ে চলেছেন, সম্ভবত বুঝতে পারছেন বিনয়। তাঁর কবি-পরিচয় নিয়ে কারওর কোনও মাথাব্যথা নেই। কবির মিছিলে স্থান হচ্ছে না তাঁর। শুধু রুশ ভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারেই তিনি যেন ছাই ফেলানোর ভাঙা কুলো! আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে একজায়গায় বলেছেন— "...বিমান সিংহ আমাকে বললেন, 'লেরমনতভ'-এর জীবনীটাও লিখে দিন। সম্পাদকমণ্ডলীর তাই ইচ্ছা। আমি মনে মনে ভাবলাম, 'এক চেখভের জীবনী ছাপা হবে এনসাইক্লোপিডিয়া 'ভারতকোষে' তাতেই আমার জীবন ধন্য— আর লেরমনতভ-এর দরকার নেই।' বিমান সিংহ মহাশয়কে বললাম— না, লেরমনতভের জীবনী অন্য কাউকে দিয়ে লেখান আপনারা।..."

দ্র. ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৭

১৯৭. 'স্বনির্বাচিত' গ্রন্থটি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাবিশিষ্ট হয়ে অনির্বাণ প্রকাশনীর পক্ষে ৩-এ গঙ্গাধরবাবু লেন, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। এই গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বিনয় তাঁর জীবিকা উল্লেখ করেছিলেন "কবিতা আঁকা ও ছবি লেখা"।

দ্র. ঐ, 'গ্রন্থ-পরিচয়', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ১০১

বাংলা সাহিত্যজগতে 'সাহিত্যিক-চিত্রশিল্পী' কম্বিনেশনটি খুব দুর্লভ নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যজিৎ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রমুখ তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। আর বিনয় যে ছবিটা বরাবর ভালোই আঁকতেন, বড়দা অনিলবরণের স্মৃতিচারণা থেকে তা জানা যায়—

"...আর একটা ব্যাপার উল্লেখ না করলে লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে বিনয়ের ছবি আঁকার ক্ষমতা। ওর আঁকা দুখানা ছবি আমাদের শিমুল্পুরের বাড়িতে আছে।"

দ্র. অনিলবরণ মজুমদার, ‘আমার ছোটো ভাই – বিনয়’, ‘নৌকো’ সাহিত্য পত্র, নির্বাচিত গদ্য সংকলন (২৫ বছর), (সং. ও সম্পা.) অমলেন্দু বিশ্বাস, ২০১০, বিরাটি, পৃ. ৯১

বিনয় নিজেও ‘কিছু পুরনো স্মৃতি’ লেখাটিতে সহপাঠী প্রীতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অঙ্কন-শিক্ষা শিখনের কথা বলেছিলেন।

দ্র. বিনয় মজুমদার, ‘কিছু পুরনো স্মৃতি’, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৯

একটি সাক্ষাৎকারেও বিনয় বলেছিলেন— “আমি ছবি এঁকেছি স্কুলে পড়ার সময়। কলেজে পড়ার সময়। সে ছবির একটাও এখন আমার কাছে নেই।”

দ্র. ঐ, ‘আলাপচারিতা : ২’, কথোপকথনে— মারুফ হোসেন, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর ’৯৯, বারাসাত, পৃ. ২০৩

‘স্বনির্বাচিত’ সংকলনের দুই সম্পাদককে তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে বিনয় জানিয়েছিলেন তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘পাখি’, ‘সাহিত্যপত্র’ পত্রিকায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিলো।

দ্র. ঐ, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ১০১

কিন্তু, ‘স্মৃতিকথা’-য় বিনয় জানাচ্ছেন যে, তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিলো বৌলতলি বিদ্যালয়ের ছাত্রপত্রিকায়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।

দ্র. ঐ, ‘স্মৃতিকথা’, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭৪

তথ্যের সময়কালবাচক এই অনভিপ্রেত তারতম্যটি বিনয়ের স্মৃতির স্বেচ্ছাচারের জন্যই বোধহয় ঘটেছে।

১৯৮. দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) বিনয় মজুমদার, ‘আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব’, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৩-৬৪

‘বেলা অবেলা’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিনয় মজুমদারের ‘আত্মপরিচয়’ নামক লেখাটি ‘ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য’ গ্রন্থে ‘আত্মপরিচয় : প্রথম পর্ব’ নামে সংকলিত হয়েছে। তবে, লেখাটি প্রথম গ্রন্থগত হয় ‘বেলা অবেলা’ প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘আত্মপরিচয়’ গ্রন্থটিতে।

১৯৯. বিজ্ঞাপনটি যে ভাবে ও ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হয়েছিলো, অবিকল তা এ’রকম—

বিনয় মজুমদার

.....

ফিরে এসো, চাকা

এই কবিতাগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়

সাত বছর আগে। বিশাল পাঠকসমাজ যদিও

এটির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না, বাংলা কবিতার সবচেয়ে

অগ্রসর পাঠক ও ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষক মহলে ‘ফিরে এসো, চাকা’

এই কয় বছরে একটি গুপ্ত ক্লাসিকের স্থান ক’রে নিয়েছিলো। অবশ্য

এমনকি এই সব মহলেও এর খ্যাতির ভিত্তি ছিলো প্রধানত কল্পনা,

জনশ্রুতি ও কবির জীবন-বিষয়ে কিংবদন্তি; বইটির প্রথম সংস্করণ খুঁটিয়ে

পড়া তো দূরের কথা, এমনকি হাতে ধরার, এমনকি চোখে দেখার

সৌভাগ্যও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র রসিক, অন্তরঙ্গ, অধ্যাবসায়ী ও

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়েছে। ফলে ‘ফিরে এসো, চাকা’

গ্রন্থে কেবল এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীর ছিলো অধিকার।

বর্তমান কলকাতা-সংস্করণ এই গুপ্ত ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ‘ফিরে এসো, চাকা’ কেবল কোনো ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর সম্পদ নয়, তা বাংলা কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। ‘ফিরে এসো, চাকা’ ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ কি ‘অর্কেস্ট্রা’-র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি কেবল জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।

কলকাতা-সংস্করণে

বিনয় মজুমদার-এর কবিতা গ্রন্থ

ফিরে এসো, চাকা তিন টাকা

অঘ্রানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ

‘প্রতিভাস’ প্রকাশিত বিনয় মজুমদারের কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড (তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০০৬, বইমেলা)-এ ‘পরিশিষ্ট—জ’ অংশে বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনটি সংকলন করেছেন সম্পাদক শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পৃ. ১৩৮-১৩৯

‘অঘ্রানের অনুভূতিমালা’ অবশ্য ‘কলকাতা’ সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। পরে ‘অরুণা প্রকাশনী’-র তরফে শ্রীমতী অরুণা বাগচী এটি প্রকাশ করেন।

২০০. দ্র. (পুনর্মুদ্রিত) সনাতন পাঠক, ‘একটি অসাধারণ কবিতার বই’, অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৪৮

২০১. দ্র. কঙ্কাবতী দত্ত, ‘প্রাসঙ্গিক’, গায়ত্রীকে (বিনয় মজুমদার), প্রতিভাস, প্রথম ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ. সেপ্টেম্বর ২০০২, কলকাতা-২

তবে, তীব্র স্বাদের প্রতি প্রীতি ও প্রবণতা বিনয়ের জিনগত হওয়া সম্ভব। বিনয়কে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করার পর

থেকে বিনয়ের মুক্তির আগের সময়টিতে জ্যোতির্ময় প্রায়ই ঠাকুরনগর যেতেন। সেখানেই "একদিন আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য সারা বাগান ঘুরে বিপিনবাবু সংগ্রহ করে আনলেন একমুঠি সবুজ বড়-এলাচ সদৃশ লঙ্কা-যা এত ঝাল যে তাঁর মতে এক কড়াই ডালের জন্য একটি লঙ্কার একচতুর্থাংশই যথেষ্ট।..."

দ্র. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৭-১৫৮

২০২. অমিয় দেব, 'কবিতা, গণিত ও বিনয় মজুমদার', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ৯৯

২০৩. ঐ, পৃ. ১০০

২০৪. ঋত্বিক ঘটক, 'সাম্প্রতিককালের এক কবি', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১০৮

২০৫. ঐ

২০৬. হুমায়ূন আহমেদ, হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টুভাই, অন্যপ্রকাশ, দশম মুদ্রণ : একুশের বইমেলা ২০১২, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৭৭

২০৭. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৭

এক ধরনের দ্বৈপায়নধর্ম ক্রমশ বিনয়ের পরিবারের সকলেরই নিয়ামক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠে কোলবর্তী মানুষগুলোকে যেন দিন-দিনই বিচ্ছিন্ন বিন্দু করে তুলেছিলো। অগ্রজের যে স্নেহ অনুজের দিকের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, এ-পরিবারের ক্ষেত্রে কখনওই তা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। বিনয়ের লেখা তিনটি কবিতা থেকেও তেমনই ইঙ্গিত মিলছে—

ক.

"কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলো

আমার বড়ো দাদা অনিলবরণ।

তারপরে নানারূপ সহজ কারণে

বড়ো দাদা বারংবার পরীক্ষায় ফেল করেছিলো।

সেইহেতু ডাক্তারী পড়া বন্ধ ক'রে

গোড়া থেকে বি.কম. পড়েছে।

এবং তখন দাদা লোয়ার ডিভিশন কেরানির চাকরি করেছে।

যাই হোক এইসব আমার বড়ো দাদার জীবনী।"

দ্র. বিনয় মজুমদার; 'কলকাতা মেডিক্যাল'; (কা. গ্র. 'আমিই গণিতের শূন্য'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৬৯

তির্যক ভঙ্গিমায় লেখা শ্লেষাত্মক এ-লেখাটি আসলে যে বড়দা'র জীবনী লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়নি, বেশ বোঝা

যায়।

খ. ‘‘এখন আমরা সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছি।
শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ কাটছে
একজন। অনেক উচ্চাশা নিয়ে বাবা
পশ্চিম পাশের ওই দ্বিতীয় দালান বানিয়েছিলো।
দালানের গায় বাবা নিজের নামটিও লিখেছিলো ‘বিপিন কুটীর’।
যাই হোক শেষ অবধি আমি একা একা
বাবার মায়ের এই বাসস্থানে বাড়িতে প্রথম দালানে
আমি থাকি।...’’

দ্র. ঐ, ‘এখন আমরা সব’, ঐ

এবং

গ. ‘‘আজ একজন বৃদ্ধা বেড়াতে এসেছিলেন
আমাদের বাড়িতে বিকালে।
বিশ্বের বৃদ্ধাটি ব’সে আমার বাবার সঙ্গে
কথা বললেন,
তখন সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না, ফলে
আমার বাবার কাছে তিনি কী বলেছিলেন
আমি তা শুনিনি।
যখন হাত পা ধুয়ে আমার ঘরের মধ্যে
হাত পা মুছছিলাম আমি
তখন বিশ্বের এই বৃদ্ধাটি আমার ঘরে
প্রবেশ করেছিলেন একা।
এবং আমার সঙ্গে অল্পকটি কথা ব’লে
ফিরে চ’লে গেলেন বাইরে।
আসলে বিশ্বের এই বৃদ্ধাটি আমার দিদি হন।’’

দ্র. ঐ, 'বৃদ্ধা', (কা.গ্র. 'আমি এই সভায়'), ঐ, পৃ. ৯৭

২০৮. এই রেণু বসুর সাহচর্যেই বিধ্বস্ত বিনয় তবু তাঁর আহূত মৃত্যুর মানচিত্রকে একমনে রূপরেখা দিয়ে যেতে পেরেছেন। মজুমদার পরিবারের বহুদিনের আশ্রিতা রেণুর বাবা অন্যপুরুষাসক্ত স্ত্রীর উপর অভিমানে একবস্ত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। কতকাল মাকে দেখেননি, তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের বাৎসল্য, মমত্ব, ভালোবাসা সব বর্তেছিলো পোষা বেড়ালের প্রতি। জ্যোতির্ময় দত্ত ঠাকুরনগর গেলে তিনি হেসে কাছে এসে দাঁড়াতেন।

দ্র. জ্যোতির্ময় দত্ত, 'একটি সমাহিত আগ্নেয়গিরি', বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ১৫৭

২০৯. ঐ, পৃ. ১৫৮

২১০. দ্র. অমিয় দেব, 'কবিতা, গণিত ও বিনয় মজুমদার', প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর '৯৯, বারাসাত, পৃ. ১০০

২১১. বিনয় লিখছেন— "...কফি হাউসে ইন্দ্র লাহিড়ির সঙ্গে দেখা। ইন্দ্র বললো, 'দাদা, আপনার শাড়ি-কেনা কবিতাটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে।' 'ক্ষুন্না' পত্রিকার সম্পাদক বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ১৯) লিখলো যে এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারটি কবিতা 'বাল্মীকির কবিতা' বইতে আছে।...তা ওই ১৯ বছরের সম্পাদক বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় 'ক্ষুন্না' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলো। প্রবন্ধের নাম দিলো 'এ যুগের বাল্মীকি।' অর্থাৎ আমি স্বয়ং এ যুগের 'বাল্মীকি।' "

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৬৯-৭০

বিনয় মজুমদারের কবিতার পিঠে 'অশ্লীলতা'-র ট্যাগ কিন্তু 'বাল্মীকি'র পর্যায়েই প্রথম বসেনি। বরঞ্চ, ষাটের দশকের শুরুতে হাংরি আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে বিনয়ের পদ্যমধ্যস্থ যৌনতার ভাষ্যকে 'অশ্লীল' নাম দিয়ে অস্ত্রস্বরূপ প্রয়োগ করতে দেখি কৃত্তিবাসের কবিদের। ১৯৬৩, 'কৃত্তিবাস'-এর 'ষোড়শ' সংকলন বেরিয়ে গেছে। 'রাস্তার ওপর ছাতার তলায় ঘুমিয়ে আছে ছোট একটা মেয়ে'— অ্যালেন গীন্‌সবার্গের তোলা এমন একটি ছবি পত্রিকার প্রচ্ছদপট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সূচনাপৃষ্ঠায় মোটা হরফে ঘোষণা লেখা ছিলো : 'তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বীটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবুতা ও বিস্ফোরণ।' তারপর, 'তরুণদের আর বোঝা যায় না কিছু'— প্রাজ্ঞ বুদ্ধদেব বসু ও আরও অনেকেরই মনের এই কথাটির প্রতিবাদ পেশ করতে দক্ষিণ কোলকাতার লেক-সংলগ্ন একটি বাড়িতে 'কৃত্তিবাস'-এর তরফে এক কবিতাসভার (সুনীলের ভাষায় 'যুদ্ধ') আয়োজন করা হয়েছিলো। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত-এর দিক্‌পাল সাহিত্য-সমালোচকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভাটিতে কবিতা পড়ার সময়কার স্মৃতি শঙ্খ ঘোষের চিত্রণে এখনও উজ্জ্বল— "...বিনয়ের কবিতা অবশ্য অন্য কাউকে পড়তেই হত, কেননা বিনয় আসেনি। আসেনি অবশ্য অলোকরঞ্জনও, অলোকের নাকি জ্বর। বিনয়ের দায়িত্ব নেয়, স্বভাবতই, জ্যোতি। জ্যোতি উঠে প্রথমে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণই দিয়ে বসে, কবিতা বিষয়ে ভাষণ। সাম্প্রতিকদের লেখাপত্র নিয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে তার এবং তার বন্ধুবান্ধবদের মতান্তরের আর রুচিভিন্নতার তর্ক বিষয়ে কথা বলে কিছুটা, যুদ্ধভঙ্গিমাটা এবার উঠে আসে একেবারে প্রত্যক্ষে। কথা শেষ করে, 'ভাগ্যিস, কল্পনা খড়ি নয়' আর 'ধিক্ জ্যোতি, ধিক' কবিতাদুটি পড়ে ঘোষণা করে সে : 'এবার বিনয় মজুমদারের একটা কবিতা পড়ব আমি। কবিতাটা খুবই অশ্লীল।'

"ঘোষণা শুনে সবাই নড়েচড়ে বসে। চকিতে একবার দেখে নিই শশীবাবুর টকটকে ফর্সা মুখের রক্তিমাভা। কবিতাটা পড়াই তো যথেষ্ট, সভাপতির গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে অশ্লীল বলে অগ্রিম ঘোষণা করবার কী দরকার? শশীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছি আমি। জ্যোতি শুরু করে তার কবিতাপাঠ, বিনয়ের কবিতা।..."

দ্র. শঙ্খ ঘোষ, ‘কৃত্তিবাসের যুদ্ধ’, কৃত্তিবাস (নবপর্যায়), (সম্পা.) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অষ্টম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৩, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, পৃ. ১১

২১২. বিনয় একটি সাক্ষাৎকারে বলছেন— “ভারত সরকার ঠিক করল দুর্গাপুর থার্মাল প্লান্টের কিছু ইঞ্জিনিয়ারকে ফর হায়ার স্টাডিস জাপানে পাঠানো হবে। আমার যাওয়া হয়নি, কারণ আমি তিন-চার মাস পরেই বাড়ি চলে আসি।...ফলে আমার আর জাপানে যাওয়া হয়নি।...

“...বার্লিনে নেমন্তন্ন করেছিল আলেকজান্ডার ডি ভার্স্ট বলে একজন ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। আমি তাঁকে দরখাস্ত দিই, আমি চাকরী করতে চাই জার্মানিতে। আমি তাঁকে আমার গণিতের গোটা কয়েক খাতা পাঠিয়েছিলাম। সেগুলি পড়ে উনি আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, তুমি এসো, আমাদের বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক কষাবে। তোমাকে মাইনে দেওয়া হবে ইউ.এস.এ. স্কেলে। তখন আমি বাবাকে বললাম, বাবা আমাকে দেখছি জার্মানিতে ডেকেছে। অঙ্ক কষাতে হবে এম.এসসি ক্লাসে, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাবা বললেন : দ্যাখ্, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি। আমার বয়স আশি-পঁচাশি বছর। তোর মায়ের বয়সও ওইরকম। আমাদের বাড়িতে দেখাশুনা করার মতো কেউ নেই। তুই-ই একা আছিস। তুই আর যাস্‌নে কোথাও। আমাদের দেখাশুনা কর। সুতরাং, আমি আর জার্মানিতে যেতে পারিনি।”

দ্র. বিনয় মজুমদার, ‘৬ নং সাক্ষাৎকার’, মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৮৮

২১৩. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পরিশিষ্ট-গ’, কাব্যসমগ্র, ১ম খণ্ড (বিনয় মজুমদার), (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ— জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা), কলকাতা-২, পৃ. ১২৭

২১৪. জয় গোস্বামী, ‘মিলন’, প্রেমের কবিতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুলাই ২০০৪, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ৪৬

২১৫. বিনয় মজুমদার, ‘২৩ জুলাই ১৯৬১’, ফিরে এসো, চাকা; অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, পৃ. ২৪

২১৬. ঐ, ‘২৩ জুলাই ১৯৬১’, ফিরে এসো, চাকা; অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, পৃ. ২৫

২১৭. ঐ, ‘২৭ জানুয়ারী ১৯৬২’, ফিরে এসো, চাকা; অরুণা প্রকাশনী, চতুর্থ মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, পৃ. ২৫

২১৮. দ্র. কঙ্কাবতী দত্ত, ‘প্রাসঙ্গিক’, গায়ত্রীকে (বিনয় মজুমদার), প্রতিভাস, প্রথম ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০২, কলকাতা-২

২১৯. শারদ দেওড়া, ‘কলেজ স্ট্রিটের মসীহা’, (অনু. সুবিমল বসাক), বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা, ‘কবিতীর্থ’ পত্রিকা, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, পৃ. ৬৭-৬৯

২২০. র‍্যাঁবো; ‘শব্দের রসায়ন’ (প্রলাপ ২); নরকে এক ঋতু; (অনু.) লোকনাথ ভট্টাচার্য; এবং মুশায়েরা; দ্বিতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১৯; এপ্রিল ২০১২; কলকাতা-৭৩; পৃ. ৩০

২২১. বিনয় নিজেই বলছেন— “...আমার ‘কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের’ সম্পাদক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছি ওই বইয়ের অশ্লীল কবিতাগুলি বাদ দিতে— ওই বইয়ের মানে ‘বাল্মীকির কবিতা’ বইখানার। আশা করি তাতে বাঙালিজাতির রাগ হবে না।...আমার ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইতে আমি মোট চারটি কবিতা রেখেছি ভুট্টা, গুহা, চাঁদ বিষয়ক।

ভুট্টা, গুহা, চাঁদ নিয়ে লেখা এই চারটি কবিতা ('শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইয়ের) নেওয়া হোক 'কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডে'। ভুট্টা, গুহা, চাঁদ নিয়ে লেখা অন্য কবিতাগুলি একেবারে বাদ। এইটেই আমার শেষ অনুরোধ সম্পাদক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বাঙালিজাতি যেন ভুলে যান যে ভুট্টা, গুহা, চাঁদ নিয়ে আমি ৬০টির বেশি কবিতা লিখেছিলাম।"

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭০

২২২. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London

২২৩. বিনয় মজুমদার, 'নানা কথা', 'নৌকো' পত্রিকা, (সম্পা.) অমলেন্দু বিশ্বাস, বিশেষ বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৫

২২৪. সাধারণ পোস্টকার্ডে লেখা চিঠিটি এরূপ :

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

এজরা ওয়ার্ড (একতলা)

কলকাতা-১২

২১ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮

মহকুমা শাসক

মান্যবরেষু,

আমাকে আপনি নিজে বাড়ি থেকে মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে এনেছিলেন। ডাক্তারবাবুদের মতে আমি এখন সুস্থ। আমাকে ছুটি দিতে চাইছেন। কিন্তু আমার দাদা বলেছে যে আমাকে হাসপাতাল থেকে কেউ যদি বাড়ি নিয়ে যায় তবে তার বিরুদ্ধে মামলা করবে। অর্থাৎ আমার দাদার ইচ্ছা যে আমি সারাজীবন হাসপাতালেই থাকি।

আমার বাড়িতে যে অনিল মণ্ডলকে রেখে এসেছি বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য তাকে তাড়িয়ে দিতে চায় আমার দাদা। আমার বাড়ি থেকে অনিল মণ্ডল চলে গেলে আমাকে দেখাশোনা করার কেউ থাকবে না।

অতএব আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনি যথাশীঘ্র সম্ভব আমাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে যান, ও অনিল মণ্ডলকে রক্ষা করুন।

বিনয় মজুমদার

শান্তিময় প্রধান

মহকুমা শাসক

বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

আন্তর্জাতিক ভাষাদিবসের দিনেই পীড়িত বিদগ্ধ এক ভাষাশিল্পীর এই আর্ততা আমাদের দগ্ধ করে।

দ্র. ঐ, অশ্বিনীতারার কবি : বিনয় মজুমদারের জীবনকথা (অমলকুমার মণ্ডল), কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৭৬

হাসপাতালের গাছ থেকে বাচ্চাদের আম পেড়ে নেবার দৃশ্য দেখে লেখা একটি কবিতায় ওখানে ভর্তি বিনয় পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি (শিমুলপুরের জমিসমেত বাড়িটি, যা বিনয়ের জীবনমরণের শেষ মনজিল)-র উত্তরাধিকার নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের আশঙ্কায় শিহরিত হন—

"আমার হাসপাতালে ব'সে ব'সে দেখলাম বালকেরা আম পেড়ে নিলো

হাসপাতালের গাছ থেকে আম পেড়ে নিলো দুপুরবেলায়

আমার মফঃস্বলের বাগানবাড়িতে ছটি আমগাছ আছে

মেজদা কখনো গ্রামে যাবে না বলেই মনে হয়।

বড়োদাদা যেতে পারে আমার মফঃস্বলের বাড়িতেই অবসরগ্রহণের পরে

আপাতত এইসব চিন্তা আর আলোচনা করা আছে আগে।

এইসব গ্রাম্য আম পাকাতে পারব কি ভবিষ্যতে

বিশেষণ পদ যদি ক্রিয়াপদ করি তবে বিশেষ্য পদগুলিকে ক্রিয়াপদ

করব আমিই।"

দ্র. ঐ, 'আমার হাসপাতালে', (কা.গ্র. 'কবিতা বুঝিনি আমি'); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ২১৭

২২৫. ঐ, 'আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব', ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭০

২২৬. শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা', বিনয় মজুমদার, এখন; কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) (বিনয় মজুমদার), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৮০৯, এপ্রিল ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ২৪৯

২২৭. অনিলবরণ মজুমদার, 'আমার ভাই বিনয় ও অন্যান্যরা', বিশেষ বইমেলা সংখ্যা, 'নৌকো' পত্রিকা, (সম্পা.) অমলেন্দু বিশ্বাস, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, বিরাটি, পৃ. ৪১-৪২

২২৮. বিনয় মজুমদার, 'সবাই জানে (২)', বিশেষ বইমেলা সংখ্যা, 'নৌকো' পত্রিকা, (সম্পা.) অমলেন্দু বিশ্বাস, জানুয়ারি ২০০৭, বিরাটি, পৃ. ১০

২২৯. সুকৃতি, 'বিনয় মজুমদারকে আমরা যেভাবে দেখেছি', বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা, 'কবিতীর্থ' পত্রিকা, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, পৃ. ১৪৫

২৩০. বিনয় মজুমদার, '৪ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৭৬-৭৭

এ-নিয়ে কিছু খেদ, কিছুটা শ্লেষ বিনয় একটি কবিতাতেও উগ্‌ড়েছিলেন :

“‘পশ্চিমবঙ্গের পাগলা গারদ সমূহের পরিদর্শক’ আমি। আমার সরকারী

চাকরিই তাই। যা বেতন পাই তাতে মোটামুটি সংসার চ’লে

যায়—একার সংসার।”

(খণ্ডিতাংশ)

দ্র. ঐ; ‘পশ্চিমবঙ্গের’; (কা.গ্র. ‘আমিই গণিতের শূন্য’); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রতিভাস; (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৭৩

অন্য একটি কবিতায় লঘু বিদ্রূপের আড়ালে আসলে নিহিত পাগলাগারদ নিয়ে কবির স্পর্শকাতরতাটিই :

“আমি মাত্র একবার দিল্লী মহানগরীতে গেছি।/ আর কোনোদিন আমি দিল্লীতে যাব না।/ শান্তিনিকেতনে আমি একবারই গেছি/ এই শান্তিনিকেতনে আমি ফের কখনো যাব না।/.../ এটা অতি মূল্যবান কথা যথা একবার পাগলাগারদে/ গেলে যে দ্বিতীয়বার পাগলাগারদে যেতে হবেই/ তা নয়।/...”

দ্র. ঐ, ‘গুচ্ছ কবিতা-৩’, অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত বিনয় মজুমদার) ,শিবেন মজুমদার ও বৈদ্যনাথ দলপতি কর্তৃক সংগৃহীত ,(ইতিকথা পাবলিকেশন প্রথম প্রকাশ ,: জানুয়ারি ২০১৭ ,পরগনা ২৪ উত্তর ,চাঁদপাড়া ,শিমুলিয়াপাড়া , .পৃ ,৭৪৩২৪৫ ৭৪

[শারদীয়া সীমান্ত বাংলা: ১৪১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।]

২৩১. অজয় নাগ, ‘বিনয় মজুমদার’, বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ. ৩৩

২৩২. বিনয় মজুমদার, ‘৪৫ সংখ্যক কবিতা’, (কা.গ্র. ‘এক পঙক্তির কবিতা’), কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৮০৯, এপ্রিল ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ১২১

২৩৩. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London

২৩৪. বিনয় বলছেন— “একজন মাত্র প্রকাশকের সঙ্গে আমার বই প্রকশের চুক্তি হয়েছে, লিখিত চুক্তি হয়েছে। তিনি বীজেশ সাহা, প্রতিভাসের মালিক। অর্থাৎ আমার ‘কাব্যসমগ্র’ বইখানি খণ্ডে খণ্ডে বেরোচ্ছে লিখিত চুক্তি অনুসারে। আর কোনো প্রকাশকের সঙ্গেই আমার লিখিত চুক্তি হয়নি, মুখে মুখে চুক্তি হয়েছে। মুখে মুখে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও এইসব প্রকাশকগণ আমাকে রয়্যালটি ঠিক দিয়ে যাচ্ছেন।”

দ্র. বিনয় মজুমদার, ‘আত্মপরিচয় : দ্বিতীয় পর্ব’, ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ ও অন্যান্য, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভাস, ২য় সংস্করণ, ১ ডিসেম্বর, ২০০২, কলকাতা-২, পৃ. ৭০

২৩৫. অমিয় দেব, ‘কবিতা, গণিত ও বিনয় মজুমদার’, প্রচ্ছায়া, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, (সম্পা.) শৌনক বর্মন, ১৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা, অক্টোবর ’৯৯, বারাসাত, পৃ. ৯৯

২৩৬. বিনয় মজুমদার, ‘বিচ্ছিন্ন দিনলিপি’, বিনয় মজুমদারের ডায়েরি, (সম্পা.) অজয় নাগ, কমল মুখোপাধ্যায়; শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা পুস্তকমেলা, পৃ : ১০৬

২৩৭. ঐ, 'আমরা দুজনে মিলে', হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১০, মে ২০০৩; কলকাতা-২৩, পৃ. ১৬

২৩৮. সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ :

পিনাক : স্যার, আমরা খিবরের কাগজে পড়লাম এ বছরের সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারটা আপনি বাড়িতে বসেই নিতে চেয়েছেন, আপনি...

বিনয় : না না, ও সব মিথ্যে। সব মিথ্যে লিখেছে। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে নি। কেউ কথাও বলেনি। সব বানিয়ে লিখেছে। পিনাক : তাহলে আপনি যাচ্ছেন?

বিনয় : হ্যাঁ, আমি পুরস্কার আনতে যাবো।

.....

পিনাক : তাহলে আপনি নিশ্চয়ই প্লেনে যাচ্ছেন?

বিনয় : না, প্লেনে না ট্রেনে ঠিক হয় নি। ঐ দিল্লী থেকে যা করবে...

পিনাক : তবে ওদের নিশ্চয়ই বোঝা উচিত, আপনার বয়স হয়েছে আর শরীরের অবস্থাও ভাল না...

স্নিগ্ধদীপ : স্যার, আপনি কি এই লং জার্নির ধকল নিতে পারবেন?

বিনয় : আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি গিয়ে একদম হাতে হাতে নিয়ে আসবো।

(সংক্ষেপিত)

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'নকশাল আন্দোলনকে আমি অপছন্দ করতাম', তাং— ১২/১/২০০৬, কথোপকথনে : স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী ও পিনাক বণিক, অহর্নিশ, দশম বর্ষ চতুর্দশ সংকলন শীত ১৪১৩, শুভাশিস চক্রবর্তী কর্তৃক ৫০৫/৮ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৯

২৩৯. শ্রীজাত, 'ব্যাটাচ্ছেলে', উড়ন্ত সব জোকার, আনন্দ, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৪, কলকাতা-৯, পৃ. ২৭

২৪০. একটি পত্রিকার 'বিনয় স্মরণ সংখ্যা'য় বিনয়ের লেখা চিঠিটির ফোটোকপি মুদ্রিত হয়েছে। বয়ানটি নিম্নরূপ :

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

আপনার চিঠি আমি দিব্যি পড়লাম। এক চোখে দেখতে পাই। আমার বয়স ৭২ বছর। কবিতা আর লিখি না। কোমরের বাত গোটা ছয়েক বড়ি খেলেই সেরে যায়। বছর খানেক পরে আবার বাত হয়। আবার সারে। কিন্তু

১. ৩৫ বছর যাবৎ যে কান কালা তা তো আর সারবে না।

২. ৩৫ বছর যাবৎ যে চোখ কানা সে চোখে আর কোনো ভাবেই দেখা যাবে না।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় [সচিব পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমি/ পশ্চিমবঙ্গ সরকার] আমাকে পাশে বসিয়ে ঘণ্টা তিনেক

যাবৎ আমাকে দেখেছেন তিনি জানেন আমি কেমন আছি। আপনি তাঁর কাছ থেকে শুনে নিন আমি কেমন আছি।

আমার দাঁত, কান ও চোখ চিকিৎসাতীত অবস্থায় রয়েছে। বহু বছর যাবৎ।

সুতরাং আমি আমার চিকিৎসার সম্মতি দিলাম না।

আমি আবার লিখছি আমাকে নিয়ে আর আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না।

নমস্কার নিন

ইতি

বিনীত

বিনয় মজুমদার

ঠিকানা :

গ্রাম : শিমূলপুর

ডাকঘর : ঠাকুরনগর

জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা

তারিখ

৭ জুন ২০০৫

দ্র. বিনয় মজুমদার, 'কবির অপ্রকাশিত পত্রাবলী', 'উদ্ভেদ' পত্রিকা, বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা, (সম্পা.) অমলকুমার মণ্ডল, ২০০৭, বেলঘরিয়া, পৃ. ৬৯

অন্য একটি ছোট পত্রিকার জন্য লেখা লেখাতেও এ-নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গ-আক্ষেপ দেখতে পাই—

"আমার এই আলোচনাটি অর্থাৎ লেখাটি বড় বড় পাইকা অক্ষরে যদি ছাপেন সম্পাদক তবে ভালো হয়। তাহলে আমি এমার প্রবন্ধটি পড়তে পারব ছাপা অক্ষরে। ~~কারন~~ [কারণ] ~~পাগোলের~~ [পাগলের] মহৌষধ খেয়ে আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে।"

দ্র. ঐ, 'বিনয়ম জুমদারের সাহিত্য সমালোচনা', বহ্নি, (সম্পা.) অনির্বাণ রায়চৌধুরী, সপ্তম বর্ষ, স্বপ্ন সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫, পৃ. ০১

২৪১. দ্র. ঐ, 'স্বাধীনতা সম্পর্কে আমি কিছুই ভাবি না', কামড়, (সম্পা.) ঋপণ আর্য, কুমড়া-কাশীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. অনুল্লেখিত

ও

দ্র. ঐ, 'বিনয়ম জুমদারের সাহিত্য সমালোচনা', বহ্নি, (সম্পা.) অনির্বাণ রায়চৌধুরী, সপ্তম বর্ষ, স্বপ্ন সংখ্যা, বইমেলা ২০০৫, পৃ. ০১

২৪২. দ্র. ঐ, 'স্বাধীনতা সম্পর্কে আমি কিছুই ভাবি না', কামড়, (সম্পা.) ঋপণ আর্য, কুমড়া-কাশীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. অনুল্লেখিত

২৪৩. জীবনানন্দ দাশ, 'সমারূঢ়', (কা.গ্র. 'সাতটি তারার তিমির'), শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, দশম মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১০, আগস্ট ২০০৩; কলকাতা-৭৩, পৃ. ৭৯

২৪৪. বিনয় মজুমদার, '৫ নং সাক্ষাৎকার', মুখোমুখি বিনয় মজুমদার, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ— ফেব্রুয়ারি ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ৯২

২৪৫. অমলকুমার মণ্ডল, 'ছাত্রজীবন', অশ্বিনীতারার কবি : বিনয় মজুমদারের জীবনকথা, কবিতীর্থ, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯, কলকাতা, পৃ. ৪০

২৪৬. বিনয় মজুমদার, "..কবি বিনয় মজুমদারের অন্তরঙ্গ সাক্ষাতকার..", অধরা মাধুরী, (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮, ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত, পৃ. ৩৬-৩৭

২৪৭. সুজিত সরকার তাঁর বিরক্তি চাপেননি। বলছেন— "নির্বোধ সম্পাদকেরা... বই বের ক'রে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, দোহাই, একজন মানসিক রোগীকে নিয়ে আপনাদের এই তামাশা এবার বন্ধ করুন। বিনয় মজুমদার নিজে থেকে যদি কিছু লেখেন, সেই লেখার জন্য অপেক্ষা করুন। কিন্তু জোর ক'রে তাঁকে দিয়ে লেখাতে গেলে বাংলা কবিতার সর্বনাশ হয়ে যাবে। যাঁরা বিনয়কে মহৎ কবি জেনে এইমাত্র লেখা শুরু করেছেন, তাঁরা হয়তো এগুলিকেই কবিতা হিসাবে বিবেচনা ক'রে নিজেরাও সেই ধরনের লিখতে শুরু করবেন। এতে তাঁদের ক্ষতি হবে, কবিতা সম্পর্কে মনে ভুল ধারণার জন্ম হবে।"

দ্র. সুজিত সরকার, 'বিনয় মজুমদারকে নিয়ে তামাশা এবার বন্ধ হোক', কবি কবিতা পাঠক, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ : ২০০৭, কলকাতা, পৃ. ৯৪

২৪৮. সুকৃতি, 'বিনয় মজুমদারকে আমরা যেভাবে দেখেছি', বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা, 'কবিতীর্থ' পত্রিকা, (সম্পা) উৎপল ভট্টাচার্য, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, পৃ. ১৪৭-৪৮

২৪৯. ঐ, পৃ. ১৪৫

২৫০. তীর্থঙ্কর মৈত্র, 'আমি ফের জন্মাব', বিনয় মজুমদার স্মরণ সংখ্যা, 'কবিতীর্থ' পত্রিকা, (সম্পা.) উৎপল ভট্টাচার্য, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, পৃ. ১২১

২৫১. উদ্ধৃতাংশ :

"আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের বিস্তারে।

পুনরায় প্রতারিত; কাগজের কুসুমকলিকে

ফোটাতে পারিনি আমি, অথবা সে মৃতদেহ নাকি!"

দ্র. বিনয় মজুমদার, '৪২ সংখ্যক কবিতা (১৫ মার্চ ১৯৬২)'; ফিরে এসো, চাকা; কাব্যসমগ্র, প্রথম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২, পৃ. ৫৯

২৫২. দ্র. ঐ, '৪০ সংখ্যক কবিতা (১৫ মার্চ ১৯৬২)'; ফিরে এসো, চাকা; কাব্যসমগ্র, প্রথম খণ্ড, (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস, তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি, ২০০৬ (বইমেলা); কলকাতা-২, পৃ. ৫৯